সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.

কুরআন অধ্যয়নের মূলনীতি

তরজমা

মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন

মুহাদ্দিস, খতিব ও লেখক

[অভিজাত বইয়ের ঠিকানা]

৪৩ ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

দূরালাপনী : ০১৭১১৭১১৪০৯, ০১৭১৭৫৫৪৭২৭

e-mail:_boighorbd@gmail.com, boighor2008@gmail.com

web: www.boighorbd.com

কুরআন অধ্যয়নের মূলনীতি
সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.

প্রকাশক
ব ই ঘ র -এর পক্ষে
এস এম আমিনুল ইসলাম

প্রথম বইঘর সংস্করণ
আগস্ট ২০১৪

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০০৫

প্রচ্ছদ
শাকীর এহসান উল্লাহ

কম্পোজ
ব ই ঘ র বর্ণসাজ
বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
০১৭১১৭১১৪০৯

মুদ্রণ : মাসুম আর্ট প্রেস
২৬/২ প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ১৮০ টাকা মাত্র

ISBN : 984-70168-0071-9

KURAN ODDOYNER MOLNITI : By Syeed Abul Hasan Ali Nadwi
Published by : S M Aminul Islam, **BhoiGhor :** 43 Islami Tower, 11/1 Banglabazar Dhaka-1100 **First Edition :** August 2014 © Reserved

Price : 180 Taka only

আত্মার আত্মীয়
মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী রহ.
যাঁর দরদপূর্ণ অনুপ্রেরণার ফসল অনূদিত এই গ্রন্থ

—আবিদীন

আমাদের কথা

বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যে সময়ের বিপুল জনপ্রিয় লেখক, অনুবাদক ও চিন্তাশীল আলেম মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন অনূদিত আরও কয়েকটি মূল্যবান বই আমরা প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহ তায়ালার অশেষ কৃতজ্ঞতা আদায় করছি। আলহামদুলিল্লাহ! পৃথিবীবিখ্যাত সাহিত্যিক ও ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর 'কুরআন অধ্যয়নের মূলনীতি' অত্যন্ত মূল্যবান একটি গ্রন্থ। আল্লাহর কালাম কুরআনের প্রতি যাদের মহব্বত আছে, যারা অধ্যয়ন করতে চান পবিত্র এই বাণী– তাদের কাছে এ গ্রন্থটি অনুসন্ধানী পথের সারথ্য হিসেবে বিবেচিত হবে বলে মনে করি।

আমাদের প্রকাশিত অন্য সব বইয়ের মতো এ বইটিও নির্ভুল করার ব্যাপারে সচেষ্ট থেকেছি। এ ব্যাপারে বিজ্ঞ পাঠকের সব ধরনের গঠনমূলক পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। বইয়ের মূল লেখক, অনুবাদক, প্রচ্ছদ শিল্পী এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহ তায়ালা উত্তম প্রতিদান দিন। আমিন।

পরিচালক, বইঘর
০১.০৭.২০১৪ ঈ.

প্রসঙ্গ কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ.

আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার ভাষা কোথায়? কিভাবে তাঁর শোকর আদায় করবো? তিনি আমাকে তাঁর মহাগ্রন্থের প্রাথমিক শিক্ষার্থী, কুরআনের জ্ঞান অন্বেষণে অনুসন্ধিৎসু পাঠক ও মর্ম উদ্ধারে সচেষ্ট অনুসন্ধানী নবাগতদের সামনে একটি প্রাথমিক চিত্র তুলে ধরার সৌভাগ্য দান করেছেন, যার সংকলন ও পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়েছিলো প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল পূর্বে।

এই দীন লেখকের চিন্তার ফসল, কলম ও অধ্যবসায়ের নির্যাস কোন রচনা আজ অবধি এতোটা বিলম্বে প্রকাশিত হয়নি, যেমনটি ঘটেছে এই কুরআনী খেদমতের বেলায়। এরও একটা কাহিনী আছে। এই কাহিনী শোনানো যেমন মজার বিষয়, শোনাও তেমনি লাভশূন্য নয়।

খৃষ্টাব্দ ১৯৩৪ সালে এই অধম দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামায় তাফসীর ও সাহিত্যের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করে এবং এ বিষয় দু'টি পড়ানোর দায়িত্বও যথারীতি আমাকে সোপর্দ করা হয়। দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামায় তখন তাফসীর শাস্ত্রের প্রাচীন ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলী (জালালাইন, বায়যাবী ও কাশ্‌শাফ) পড়ানো হতো। অবশ্য শুরু থেকেই এ বিষয়ের প্রতিও গভীরভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছিলো, যাতে ছাত্রদের বয়স ও যোগ্যতা হিসেবে ক্লাসভিত্তিক পূর্ণ কুরআনে কারীমের মূল অনুবাদ পড়ানো হয়। পূর্ণ কুরআনে কারীম পাঠদানের বিষয়টি দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

একই পাঠ্যসূচির অধীনে বিভিন্ন শ্রেণীর কুরআনে কারীমের সবক পড়ানোর দায়িত্ব আমাকেও দেয়া হয়। দরজায়ে শশম তথা মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের পাঠ্য তালিকায় ছিলো কুরআনে কারীমের প্রথম দশ পারা। অন্যান্য ক্লাসে যথারীতি অন্যান্য পারা পাঠ্যভুক্ত ছিলো। বরকতপূর্ণ এই খেদমত ও ব্যস্ততার সময় আমার মনে হয়েছে,

শিক্ষার্থীদের সামনে কুরআনে কারীমের পরিচয়, তার মূল লক্ষ্য, কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়সমূহ তুলে ধরা, কুরআনে কারীম দ্বারা যথাযথরূপে উপকৃত হওয়ার যোগ্যতা সৃষ্টি, সেই লক্ষ্যে তাদেরকে প্রস্তুত করা এবং এ সম্পর্কিত তাদের ভুল ধারণা, দুর্বলতা ও ব্যাধিসমূহ সম্পর্কে সচেতন ও সতর্ক করে তোলা খুবই জরুরী।

যেসব কারণে মানুষ কুরআনে কারীমের বরকত ও প্রভাব থেকে বঞ্চিত থাকে, কুরআনের মর্ম ও আবেদনের পথে যেসব বিষয় বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং এসব ব্যাধি ও অন্তরায় স্বয়ং কুরআনে কারীম বলে দিয়েছে- কুরআন পাঠ ও অধ্যবসায়ের ক্ষেত্রে এগুলো মূলনীতির মর্যাদা রাখে। কুরআনে কারীম থেকে যারা উপকৃত হতে চায়, এসব বিষয় ও মূলনীতি তাদের জন্য পথ-নির্দেশক ও বন্ধু হতে পারে। এসব মূলনীতির সহায়তায় কুরআনে কারীমের অসীম জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণের এই সফর অনেকটা সহজ ও নিরাপদ হতে পারে।

শুধু আমাদের দীনি মাদরাসাগুলোর ইতিহাসেই নয়, স্বয়ং দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামার ক্ষেত্রেও এ ছিলো এক নতুন অভিজ্ঞতা ও সাহসী পদক্ষেপ। একজন তরুণ শিক্ষক- যার বয়স সবেমাত্র বিশ অতিক্রম করেছে- এই সাহস এবং স্বীয় সম্মানিত বড় ভাই মৌলবী ডাক্তার হাকীম সায়্যিদ আবদুল আলী, নাযিম, নদওয়াতুল উলামা ও স্বীয় শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মাওলানা হায়দার হাসান খান, মুহতামিম, দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা'র অনুমতিতে এই কাজ শুরু করে।

ধারাবাহিক এই নতুন পদক্ষেপটি মাধ্যমিক স্তরের (দরজায়ে শশম) ছাত্রদের উদ্দেশ্যে 'মাযামীনে কুরআন' তথা 'আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয়' শিরোনামে সম্ভবত ১৯৩৬ বা ১৯৩৭ সালে শুরু করেছিলাম। অতঃপর কয়েক বছর পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। শিক্ষার্থীগণ বিষয়টি আগ্রহের সাথে গ্রহণ করে ক্লাসে নিয়মিত নোট করতে থাকে এবং এ বিষয়ে রীতিমতো পরীক্ষাও হতে থাকে। ধীরে ধীরে এর আলোচনার পরিধি বিস্তৃত হতে থাকে। বিষয়ে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হতে থাকে।

১৯৪০ সালে যখন তৃতীয়বারের মতো 'আন-নদওয়াহ' প্রকাশিত হতে শুরু করে, তখন এর কয়েকটি নির্বাচিত অংশ তাতে প্রকাশিত হয়। বিদায়ী ছাত্ররা বছর শেষে সযত্নে এর নোটগুলো সঙ্গে করে নিয়ে যেতে থাকে। এক পর্যায়ে লেখক ছাত্রদের কাছ থেকে ওইসব নোট সংগ্রহ করে এবং 'আন-নদওয়া'র প্রকাশিত নিবন্ধগুলোর সহায়তায় একটি নতুন পাণ্ডুলিপি তৈরি করিয়ে নেয়। কিন্তু কিছুদিন পর জানা গেলো, সংকলিত সেই পাণ্ডুলিপিটি 'গুম' হয়ে গেছে।

শিক্ষার্থীগণ বিভিন্ন স্থানের বাসিন্দা হয়ে থাকে। পাস করে যাওয়ার পর সাধারণত তারা আর মাদরাসার সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ ধরে রাখে না। তাই নতুন করে ওসব কপি সংগ্রহ করা, অতঃপর সংকলন ও কপি করা দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। তাই কঠোর শ্রমলব্ধ এই সম্পদ হারানোকে শীতল ধৈর্যের সাথে মেনে নিতে হলো। ভাবলাম, এর মধ্যেও হয়তো আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কোন হেকমত নিহিত আছে। তাই দ্বিতীয়বার কাজটি করার মতো সাহস আর হয়ে উঠলো না। তাছাড়া অন্যান্য ইলমী ও দাওয়াতী ব্যস্ততার ভিড়ে এর সুযোগও ছিলো না। দারুল উলুমের অনেক ফাযিল- যারা আমার ওসব ক্লাসে উপস্থিত ছিলো- বারবার তাগাদা দিয়েছে। এর উপকারিতার কথা ভেবে নতুন করে গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য আবদার করেছে। কিন্তু কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

হঠাৎ একদিন জানতে পারলাম, সেকালের এক স্নেহাস্পদের কাছে সেই পাণ্ডুলিপিটির একটি ফ্রেশ কপি সংরক্ষিত আছে। এতে করে এক হারানো অমূল্য রত্ন ফিরে পেলাম। পাণ্ডুলিপিটি নতুন করে পড়ে দেখলাম। বয়স ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কোথাও কোথাও সংযোজন ও সম্পাদনার প্রয়োজন অনুভব হলো। কিন্তু সাহস সঞ্চয় করতে পারলাম না। আর সেই অবসরই বা কোথায়? তাই একান্ত প্রয়োজনীয় সংযোজন ও কোথাও কোথাও কিছুটা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ নতুনরূপে ঢেলে সাজালাম। অবশ্য 'বিজ্ঞান ও ইতিহাসের আলোকে কুরআন মাজীদ ও প্রাচীন আসমানী গ্রন্থসমূহ'- প্রবন্ধটি স্বয়ং লেখকের 'মানসাবে নবুওয়ত' গ্রন্থের 'খাতামুন নাবিয়্যীন' অধ্যায় থেকে চয়ন করে এ গ্রন্থের সাথে যুক্ত করে দিয়েছি।

আরও সমীচীন মনে হয়েছে, অতীতকালের বুযুর্গানে দীনের তেলাওয়াত পদ্ধতি, কুরআনে কারীমের প্রতি তাঁদের আদব ও শ্রদ্ধা এবং কুরআন পাঠের বিস্ময়কর প্রভাবদীপ্ত ঘটনাবলীও উপস্থাপিত হওয়া দরকার। কারণ, এসব ঘটনার মধ্যে জাদুময় প্রভাব ও দিক-

নির্দেশনা থাকে, যা কোন গবেষণামূলক তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে থাকে না। তাছাড়া 'আরকানে আরবা'আহ' ও 'মানসাবে নবুওয়ত' ইত্যাদি গ্রন্থে যেসব বিষয় বিস্তারিত লেখার সুযোগ লাভ করেছি, তা এই গ্রন্থ থেকে বাদ দিয়েছি। কারণ, এসব বিষয় উল্লিখিত গ্রন্থসমূহে বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ আলোচিত হয়েছে।

মাকতাবায়ে ইসলাম লক্ষ্ণৌ'র পরিচালক স্নেহাস্পদ মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ হামযা হাসানী নদভীর অবিরাম তাগাদা ও আগ্রহে দীর্ঘ অপেক্ষার পর আমার এই পাণ্ডুলিপি এখন 'মুতালা'আয়ে কুরআন কে উসূল ওয়া মাবাদী' নামে গ্রন্থাকারে নিবেদিত হচ্ছে কুরআন মাজীদের ভক্ত পাঠক ও গবেষকদের খেদমতে। আশা করি, কুরআনে কারীমের অধ্যয়ন, গবেষণা ও কুরআন দ্বারা উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে এটি অবশ্যই উপকারী গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে।

কুরআনে কারীম অধ্যয়ন ও গবেষণার ক্ষেত্রে সহযোগী ও উপকারী অনেক বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে। কুরআনের মর্ম ও আহ্বানের পথে অন্তরায় বিষয়াবলী সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশনাসহ এমন অনেক ভ্রান্তি ও সংশয় সম্পর্কেও সতর্ক করে দেবে এই গ্রন্থ, পাঠক সহজেই যেসব ভ্রান্তি ও সংশয়ের শিকার হয়ে থাকেন। সেই সাথে কুরআনে কারীমের অলৌকিকতার এমন অনেক দিকও উন্মোচিত হয়ে উঠবে, যা হয়তো বা এ পর্যন্ত এতোটা স্পষ্ট ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণসহ উর্দু কোন গ্রন্থে আলোচিত হয়নি।

والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم

২৬ যিলকদ ১৪০০ হি.
অক্টোবর ১৯৮০ ঈ.

আবুল হাসান আলী নদভী
দায়েরা শাহ আলামুল্লাহ রায়হবরিলী

দু'টি কথা

মানব জীবনের শাশ্বত অব্যর্থ চিরন্তন নির্দেশনা হলো আল-কুরআন। এ কথা আমরা বারবার বলে থাকি। কিন্তু বাস্তবে কি আমরা আল-কুরআনকে নিজেদের জীবন পথের চূড়ান্ত নির্দেশনা হিসেবে গ্রহণ করছি? এ এক বাস্তব জিজ্ঞাসা। কিন্তু এর চাইতেও কঠিন জিজ্ঞাসা হলো, আমরা যারা বলছি– হ্যাঁ, কুরআন তো পড়ছি, জানা ও মানার জন্যই পড়ছি। আসলেই কি আমরা কুরআনকে ঠিক সেভাবে পড়ছি, যেভাবে পড়লে ও চিন্তা করলে পাক-কুরআন আমাদেরকে যথার্থ সঠিক ও সরল পথের সন্ধান দিবে! এ প্রশ্নের জবাব বেশ কঠিন। মূলত বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের লেখক জগদ্বিখ্যাত ইসলামী মনীষী হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) সেই কঠিন প্রশ্নেরই সমাধান দিয়েছেন অত্যন্ত সরল ভাষায়।

মাওলানা নদভী (রহ.) আমাদের নিকট-ইতিহাসের এক বিস্ময়কর প্রতিভা। পৃথিবীবিখ্যাত মহান এই সাহিত্যিক ধর্মীয় জ্ঞানে যেমন ছিলেন সুবিদিত, আধুনিক বিজ্ঞান ও তার প্রাপ্ত ও ফলিত ফলাফল সম্পর্কে ছিলেন পূর্ণ সচেতন। প্রাচীন ইতিহাস ও আধুনিক বিশ্বের চলমান জীবনসভ্যতা, রুচি-কালচারও ছিল তার নখদর্পণে। ফলে ইসলাম ও আধুনিকতা, বর্তমান ও অতীতকে তিনি খুব সহজে তুলনা করতে পারতেন, বিচার করতে পারতেন। অতঃপর তাঁর বক্তৃতা রচনা গবেষণা ও গ্রন্থনায় সেই বিচারের রস উপচে পড়তো সাহিত্যের অম্লানরূপে। মাওলানা (রহ.)-এর এই সমন্বিত চিন্তার উদার, পরিমিত, শীলিত দৃষ্টিভঙ্গী ফুটে উঠেছে এ গ্রন্থে।

এই গ্রন্থের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, হযরত মাওলানা (রহ.) পবিত্র কুরআনের পরিচয়, মুজেযার বহুমাত্রিক তাৎপর্য, কুরআন থেকে উপকৃত হওয়ার পন্থা এবং কুরআন থেকে উপকৃত হওয়ার পথে অন্তরায়– ইত্যাকার অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে উপস্থাপন করেছেন সরাসরি কুরআনের ভাষায়।

কুরআন গবেষণা ও তাফসীর বিষয়ে তাঁর এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও অভিনব। তাফসীর শাস্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট ছাত্র-শিক্ষক-গবেষক সকলের জন্যই এ এক অনবদ্য উপহার।

দুই

২০০৫ সালের গোড়ার দিকের কথা। আমি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শ্বশুর, দেশের বরেণ্য আলেম, পীরে কামেল, শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা ইসহাক ফরিদী (রহ.)-এর (ঢাকার চৌধুরীপাড়া মাদরাসায়) কক্ষে বসে মাদরাসা শিক্ষার সমকালীন অবক্ষয়, শিক্ষার্থীদের নানামুখী ভাবনা, স্বয়ংসম্পূর্ণ পথচলা ইত্যাকার বিষয়ে কথা বলছিলাম। তিনি হঠাৎ করেই উঠে গিয়ে একটি ফটোস্ট্যাস্ট উর্দু বই এনে আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন– তুমি তো মাওলানার লেখা পছন্দ করো। এটা পড়ে অনুবাদ করে ফেলো।

কপিটি হাতে নিয়ে তো আমি বিস্ময়ে হতবাক। 'মুতালা'আয়ে কুরআন কে উসূল ওয়া মাবাদী'। এ পর্যন্ত কত কিতাবে আমি এই কিতাবের রেফারেন্স পেয়েছি। সন্ধান করেছি একবার পড়ে দেখার জন্য। কী কাকতালীয়ভাবে আজ এতো সহজে পেয়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে কথা দিয়ে বসি, শীঘ্রই অনুবাদ করে ফেলবো। সম্ভবত মাস দু'য়েকের মধ্যেই অনুবাদকর্ম শেষ করি। তিনি কয়েকবার জিজ্ঞেসও করেছেন– কতটুকু হলো? বড় আশা ছিলো, প্রকাশিত গ্রন্থের প্রথম কপিটি তাঁর হাতে তুলে দেবো। সে আর হলো না। আমার যে কোনো নতুন বই হাতে দিলে তিনি ভীষণ খুশি হতেন। বলতেন, আমাকে আরো কয়েকটি কপি দিও। কখনো বা কিছুই বলতেন না। প্রকাশকের কাছ থেকে কিনে নিয়ে তাঁর বন্ধুদেরকে উপহার দিতেন। নিজের এবং বন্ধুদের পাঠ-প্রতিক্রিয়া আমাকে ফোন করে জানাতেন। মাঝে-মধ্যে তাঁর বন্ধুদের সামনে আমার লেখার এমন সরল উচ্ছ্বল প্রশংসা করতেন, আমি অসীম বিব্রত হতাম। তিনি নেই। এরই মধ্যে আমার অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে। নতুন বই নিয়ে বাসায় ফিরেছি। কিন্তু উচ্ছ্বাসভরে কারো হাতে তুলে দিতে পারিনি। ভাবি, মালিক গো! এ কেমন শূন্যতায় ফেললে আমাদেরকে।

প্রিয় পাঠক! দোয়া করবেন, আল্লাহ তায়ালা যেনো তাঁর অসীম দয়া ও করুণার উসিলায় এই গ্রন্থের মূল লেখক, অনুবাদের প্রধান প্রেরণা-পুরুষ আমার মরহুম শ্বশুরসহ এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে মাফ করে দেন। আমিন।

বইটি প্রথমবার প্রকাশ করেছিল পরশমণি প্রকাশনী। দীর্ঘদিন পর পাঠকের হাতে যাচ্ছে বইঘর থেকে। আশা করি, বইটি পাঠকের কাছে পূর্বের মতোই সমাদর পাবে।

রামপুরা, ঢাকা
৫ ডিসেম্বর ২০০৫ ঈ.

দোয়ার মুহ্তাজ–
মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন

সূচিপত্র

কুরআনের পরিচয় কুরআনের ভাষায়

পবিত্র কুরআন নিজের সম্পর্কে যা কিছু বলেছে, তাতে কুরআনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। অনেক সময় চোখে পড়ে না এমন অনেক মহান ও অলৌকিক দিকও উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে সেসব বর্ণনায়। কুরআন সম্পর্কিত বিক্ষিপ্ত সেইসব আয়াত যদি সংকলিত করা হয়, গ্রন্থবদ্ধ করা হয় নতুনভাবে, তাহলে কুরআন জানার এক নয়া দিগন্ত উন্মোচিত হবে, যে দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে স্বয়ং কুরআন– নিজের মুখে। দিগন্ত উন্মোচনের এই মহান লক্ষ্যেই আমরা নিম্নে এ সম্পর্কিত আয়াতগুলো প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ তুলে ধরছি।

১. কুরআনের জ্ঞান অকাট্য, সংশয়হীন

কুরআনের সবচেয়ে বড় অলৌকিক ও মানবীয় ক্ষমতার উর্ধ্বে যে বৈশিষ্ট্য, তাহলো কুরআনের জ্ঞান ও তথ্য অকাট্য, কুরআনের ভাষ্য ও নির্দেশনা সকল প্রকার সংশয় ও সন্দেহের উর্ধ্বে।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ۝

এটা সেই কিতাব; যাতে কোন সন্দেহ নেই। *[বাকারা : ২ :২]*

وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

এবং এটা বিধানসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা। এতে কোন সন্দেহ নেই। এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। *[ইউনুস : ১০ : ৩৭]*

وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۝

এটা অবশ্যই এক মহিমাময় গ্রন্থ। কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না– অগ্র থেকেও না, পশ্চাৎ থেকেও না। এটা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। *[হামীম সাজদা : ৪১ : ৪২]*

এই বৈশিষ্ট্য কেবলই কুরআনের। মানুষের ভাষা ও রচনা এই বৈশিষ্ট্যকে স্পর্শ করতে পারেনি কোনদিন, পারবেও না। কারণ, কুরআনের মূল উৎস হলো 'ইলমে ইলাহী।' আর তা অবতীর্ণ হয়েছে 'ওহীর' মাধ্যমে। মহান ও পবিত্রতম এই উৎস সর্বপ্রকার ত্রুটি দুর্বলতা সংশয় দ্বন্দ্ব মিশ্রণ ধারণা অনুমান ক্ষয় লয় বিরোধ ও বিভিন্নতা থেকে পবিত্র। এখানে যা আছে, তা চূড়ান্ত অকাট্য ও সন্দেহাতীত। সবই পরীক্ষিত বাস্তব ও শাশ্বত। আল্লাহ তায়ালার ইলম ও জ্ঞান চূড়ান্ত। বাড়েও না, উন্নতিও করে না। তাতে বাড়া কমার কোনো স্তর নেই। অন্য গুণাবলীর মতো তাঁর ইলমও চিরন্তন, শাশ্বত। ইরশাদ হয়েছে–

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনিই সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। *[হাদীদ : ৫৭ : ৩]*

তাঁর ব্যাপক ও ব্যাপ্ত ইলম সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّمَا إِلَٰهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا

তোমাদের মা'বুদ তো কেবল আল্লাহই, যিনি ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই, তাঁর জ্ঞান সর্ব বিষয়ে ব্যাপ্ত। *[তা-হা : ১৯ : ৯৮]*

وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۝

রাসূলগণের কাছে যা আছে, তা তাঁর জ্ঞানগোচর এবং তিনি সমস্ত কিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন। *[জিন : ৭২ : ২৮]*

তাঁর দরবারে ভুল ও বিস্মৃতির কোন সুযোগ নেই। ইরশাদ হচ্ছে–

قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ۝

মূসা বললো : এর জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকট কিতাবে (লাওহে মাহফুয অথবা আমলনামায়) আছে, আমার

প্রতিপালক ভুল করেন না এবং বিস্মৃতও হন না। *[তা-হা : ১৯ : ৫২]*

মানুষের অনুভূতি ও ইন্দ্রিয়ক্ষমতা যা স্পর্শ করতে পারে না, তাও তাঁর জানা। তাঁর জ্ঞানের বাইরে বিশ্ব চরাচরের একটি পরমাণুও নেই। সৃষ্টির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিন্দু কণিকা অবধি বিস্তীর্ণ তাঁর জ্ঞান ও ইলম।

ইরশাদ করেন–

عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝

তিনি অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তাঁর অগোচর নয় অণু পরিমাণ কিছু কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কোন বস্তু। এর প্রত্যেকটি রয়েছে সুস্পষ্ট কিতাবে। *[সাবা : ৩৪ : ৩]*

আল্লাহর কিতাব আল্লাহরই জ্ঞানভাণ্ডার থেকে উৎসারিত। তাই এই মহান কালাম মহান মালিকের বৈশিষ্ট্যাবলীরও পতাকাবাহী। ইরশাদ হচ্ছে–

فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝

যদি তারা তোমাদের আহ্বানে সাড়া না দেয়, জেনে রেখো এ তো আল্লাহর ইলম মোতাবেক অবতীর্ণ এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই। তবে কি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হবে না? *[হূদ : ১১ : ১৪]*

وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

অবশ্য আমি তাদেরকে পৌছে দিয়েছিলাম এমন এক কিতাব যা পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা বিশদ ব্যাখ্যা করেছিলাম এবং যা ছিলো মুমিন সম্প্রদায়ের জন্যে পথ নির্দেশ ও দয়া। *[আ'রাফ : ৭ : ৫২]*

যেহেতু মহান এই গ্রন্থ মহান আল্লাহর জ্ঞান থেকে উৎসারিত, তাই তাতে পরস্পর কোন বিরোধ ও ভিন্নতা নেই; নেই কোন দ্বন্দ্ব ও অসঙ্গতি। কারণ,

পরস্পর বিরোধ ভিন্নতা দ্বন্দ্ব ও অসঙ্গতি হয় অজ্ঞতা, অজানা ও কম জানার কারণে। কিংবা ক্রমবর্ধমান জ্ঞান কিংবা ধারণা অনুমান বিস্মৃতি গাফলতি অসাবধানতা মিথ্যা ও অবিচারী মানসিকতার কারণে। আর আল্লাহ তায়ালা এই জাতীয় সকল দুর্বলতা ও দীনতা থেকে সম্পূর্ণ পাক ও পবিত্র। তাই তাঁর কালামও পবিত্র সকল প্রকার পারস্পরিক বিরোধ, দ্বন্দ্ব ও তথ্যবিভ্রাট থেকে। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে–

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۝

অতঃপর তারা কি কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না? যদি তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো পক্ষ থেকে হতো, তবে তারা তাতে অনেক অসঙ্গতি পেত। *[নিসা : ৪ : ৮২]*

কখনো এমনও হয়, একটি বিষয় এক পূর্ণ স্বচ্ছ-বিধৌত উৎস থেকে প্রবাহিত কিন্তু কারো কাছে সেটা পূর্ণ নির্ভরযোগ্য সূত্রে পৌঁছেনি। মূল উৎস থেকে পূর্ণ খাঁটি ও বিশুদ্ধরূপেই রওনা হয়েছে একটি বিষয়। কিন্তু তা শেষ গন্তব্য অবধি আর সংরক্ষিত, খাঁটি ও বিশুদ্ধ থাকেনি। সম্ভাব্য এ দুর্বলতাকেও স্পষ্ট করে দিয়েছে কুরআন। বলে দিয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এই কালাম পৌঁছেছে ওহীর মাধ্যমে। আর মহান এ মাধ্যম পূর্ণ সংরক্ষিত, নিরাপদ সতর্ক ও নির্ভরযোগ্য।

এতে কারো পক্ষ থেকে কোন কিছুর মিশ্রণ বা অনুপ্রবেশের অবকাশ নেই।

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ۝

নিশ্চয়ই আল কুরআন জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। এটা নিয়ে জিবরাঈল অবতরণ করেছে। তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পারো। অবতীর্ণ করা হয়েছে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়। *[শু'আরা : ২৬ : ১৯২-১৯৫]*

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝

এবং সে মনগড়া কথাও বলে না। এতো কেবলই ওহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।' *[নাজম : ৫৩ : ৩-৪]*

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۝

বলো! তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে 'রুহুল কুদুস' (জিবরাইল) সত্যসহ কুরআন অবতীর্ণ করেছে– যারা মুমিন তাদেরকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এবং হেদায়াত ও সুসংবাদস্বরূপ মুসলিমদের জন্যে। *[আন-নাহল : ১৬: ১০২]*

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ۝

নিশ্চয়ই এ কুরআন সম্মানিত বার্তাবাহকের আনীত বাণী, যে সামর্থশালী আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাসম্পন্ন– যাকে সেথায় মান্য করা হয়, সে বিশ্বাসভাজন। *[তাকভীর : ৮১ : ১৯-২১]*

এর বিপরীতে মানুষের জ্ঞানকে দেখুন। তার জ্ঞানের উৎসকে নিশ্চিতভাবে শুদ্ধ, সংরক্ষিত ও ক্রটিমুক্ত বলা যায় না। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধারণা ও অনুমাননির্ভর হয় মানুষের জ্ঞান। তাছাড়া তার জ্ঞানার্জনের মাধ্যমগুলো খুবই সীমিত এবং নিশ্চয়ই এতটা নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী নয়, যতটা শক্তিশালী নবীগণের জ্ঞানার্জনের মাধ্যম।

মানুষের জ্ঞানার্জনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো পঞ্চইন্দ্রিয়। এই পঞ্চইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান সাধারণত স্বপ্রণোদিত ও সরল হয়ে থাকে। আর যেসব বিষয়কে আমরা 'আকলিয়্যাত' বা বিবেকপ্রসূত মনে করি, সেগুলোর ভিত্তিও সেই ইন্দ্রিয় অর্জিত বিষয়াবলী। পঞ্চইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মানুষ যা জানতে পারে, তাকে পুঁজি করেই অগ্রসর হয় বিবেক ও আকলকে সঙ্গে করে। অতঃপর অর্জন করে নতুন কোন ফলাফল। অথচ এই ফলাফলের মূল ভিত্তি পঞ্চইন্দ্রিয়ের মধ্যেই রয়েছে ভুলের আমূল সম্ভাবনা। ভুল সে অহরহই করে।[১] তাছাড়া যে আকল বিবেককে সঙ্গে করে অগ্রসর হতে হয় নব ফলাফলের পথে, সেই আকল ও বিবেকেরও অনেক স্তর রয়েছে।[২]

---

[১]. পঞ্চইন্দ্রিয়, তার সম্ভাবনা ও শক্তি সম্পর্কে পশ্চিমা দার্শনিকদের মতামত জানতে হলে এই লেখকের 'মাযহাব ওয়া তামাদ্দুন' বইটি (১০-১৪ পৃ.) পড়া যেতে পারে।

[২]. এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য 'মাযহাব ওয়া তামাদ্দুন' এবং 'তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমত' গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ৫ম অধ্যায়টি দেখা যেতে পারে।

এতসব দুর্বলতা ও সংশয়ের পরও এই দাবি করা যাবে না– মানুষের জ্ঞান তার সীমিত সীমানা অবধি ব্যাপ্ত এবং সে তার গণ্ডির সব কিছু জানে। পঞ্চইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সবকিছু জানাও তার পক্ষে অসম্ভব। বস্তুজগতের এমন কত জটিলগ্রন্থি পড়ে আছে, আজ পর্যন্ত মানুষ যাকে উন্মোচন করতে পারেনি। আর মতের ভিন্নতার তো কোন সীমাই নেই। তারপর মানুষের জ্ঞান হলো ক্রমবর্ধমান। সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়, জানার পরিধি বাড়ে। তবে সেই বাড়ার সীমা জানা নেই তার নিজেরও। আর এই সীমাটাই তার দীনতার দলিল। আর সীমানাটাও যে অনির্ধারিত, এটাই তার জ্ঞানের সংশয়কে স্পষ্ট করে দেয়। প্রমাণ করে দেয়, তার জ্ঞান অপূর্ণ, দুর্বল ও দ্বন্দ্বঘেরা।

এ হলো বস্তু জগতের অবস্থা– যে জগত সম্পর্কে কিছুটা হলেও জ্ঞান আছে মানুষের। অথচ এই বস্তু জগতের বাইরে এক বিশাল জগত পড়ে আছে, যা কিনা বস্তু জগতের তুলনায় অনেক বিশাল, বিস্তীর্ণ ও ব্যাপ্ত। মানুষের জ্ঞানসীমার বাইরে যে জগত। মানুষ তো এমন, সে তার নিজের প্রকৃত রূপ ও নিগূঢ় সত্তা সম্পর্কেও অজ্ঞ। সে তার আদি অন্ত জানে না। সূচনা শেষ সবই তার জানার বাইরে। এই বিশাল জগতের সূচনা ও সমাপ্তির রহস্য সে উদঘাটন করতে পারেনি। আর আকল ও বিবেক তো নিজের গ্রন্থি-রহস্য সম্পর্কেও বেখবর!

তাছাড়া আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির বিস্তারিত ও দ্বিধাহীন ইলম তার আদেশ ও বিধানসমূহের অকাট্য জ্ঞান শুধু ধারণা অনুমান আর সুস্থ বিবেকের বলে অর্জন করা সম্ভব নয়। আল্লাহর মর্জি সে তো অনেক উর্ধ্বে। যেখানে একজন মানুষ অন্য আরেকজন মানুষের মনের চাহিদা ইচ্ছা ও আবেদন, স্বীয় অনুমান, অভিজ্ঞান ও সুস্থ চিন্তার দ্বারা জানতে পারে না– সেখানে সৃষ্টিকর্তার মর্জি ও সন্তুষ্টির পথ আবিষ্কার করবে কিভাবে?

একইভাবে সে আইন প্রণয়ন, রাজনীতি ও সমাজনীতির শৃঙ্খলা বিধানে ভুরি ভুরি ভুল করে প্রতিদিন। একই বিন্দু থেকে উৎসারিত না হওয়ার ফলে শাসনে শাসনে দ্বন্দ্ব হচ্ছে, আইনে আইনে সংঘাত হচ্ছে। এই দ্বন্দ্ব সংঘাত ক্রমাগত চলছে। লড়াই হচ্ছে জাতিতে জাতিতে। বিভিন্ন স্বার্থ ও স্বপ্নের আবেদনে মুখোমুখি হচ্ছে এক দেশ আরেক দেশের। অকাট্য ও চূড়ান্ত জ্ঞাননির্ভর না হওয়ার কারণে মানবরচিত আইন ও নীতিমালা অভিজ্ঞতা ও নীরিক্ষার ধাপে ধাপে থমকে দাঁড়ায়, বদলায়, কাঁটছাট হয়। তুলনামূলক বিশ্লেষণের বিচারে আদৃত রহিত সমন্বিত হয়। এ এক ধারাবাহিক পরিবর্তন ও রূপান্তরের পথ। বিপ্লব ও সংস্কারের সহস্র শ্লোগান উঠবে, উঠতেই থাকবে। মানুষ নিজের হাতে তৈরি, নিজের ইন্দ্রিয়জাত ও মেধাপ্রসূত আইন ও নীতি দ্বারা পূর্ণ স্বস্তি ও

নিরাপত্তার সন্ধান কোনদিন পায়নি, পাবেও না। মূলত এসব অসঙ্গতি ও সংঘাতের মূল উৎস মানুষের অপূর্ণ ধারণাজাত ইলম। এই অপূর্ণ রুগ্ন ধারণাজাত জ্ঞানের উপর সে ভরসা করেছে বলেই সর্বত্র দ্বন্দ্ব, বিরোধ ও সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছে। এ নিজের প্রতিই তার অবিচার। মানুষের ইলম সম্পর্কে কুরআন বলেছে–

وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝

তোমাদের খুব সামান্য ইলমই দান করা হয়েছে। *[বনি ইসরাইল : ১৭ : ৮৫]*

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝

তাদের অধিকাংশ অনুমানেরই অনুসরণ করে আর সত্যের মোকাবেলায় অনুমান কোন কাজে আসে না। তারা যা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। *[ইউনুস : ১০ : ৩৬]*

إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۝

তারা তো কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করে; কিন্তু সত্যের মোকাবেলায় অনুমানের কোনই মূল্য নেই। *[নাজম : ৫৩ : ২৮]*

২. কুরআনের বক্তব্য সুনির্দিষ্ট ও বিশদ

দীনের মৌলিক নীতিমালা, মানুষের পরকালীন নাজাত, মুক্তি ও সফলতার পথ অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় দ্ব্যর্থহীন ভঙ্গিতে সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়েছে পবিত্র এই কুরআনে। এতে ইসলাম ও পরকাল সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হয়েছে অত্যন্ত জোরালোভাবে।[১]

[১]. স্মরণ রাখতে হবে, দীন ব্যতীত অন্যান্য জ্ঞান বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য কুরআনের আলোচ্য বিষয় নয়। যদি এ সম্পর্কিত কোনো তথ্য বিধৃত হয়, সেটা একান্তই প্রাসঙ্গিক-মুল লক্ষ্য নয়। এসব বিষয়ে বিশদ আলোচনা কুরআনের মূল লক্ষ্য বাহির্ভূত। وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ বা এই জাতীয় আরো যতো আয়াত আছে, ওসবের অর্থ হলো লাওহে মাহফুয এবং আল্লাহর ইলম। তাছাড়া কুরআন শুধু দীনের মৌলিক নীতিমালার কথাই বলেছে। খুঁটিনাটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার বিশদ বর্ণনার কুরআনে বর্ণিত বিধানাবলীর বাস্তব রূপ ও রূপায়নের দায়িত্ব ছিলো হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর

এতসব দুর্বলতা ও সংশয়ের পরও এই দাবি করা যাবে না– মানুষের জ্ঞান তার সীমিত সীমানা অবধি ব্যাপ্ত এবং সে তার গণ্ডির সব কিছু জানে। পঞ্চইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সবকিছু জানাও তার পক্ষে অসম্ভব। বস্তুজগতের এমন কত জটিলগ্রন্থি পড়ে আছে, আজ পর্যন্ত মানুষ যাকে উন্মোচন করতে পারেনি। আর মতের ভিন্নতার তো কোন সীমাই নেই। তারপর মানুষের জ্ঞান হলো ক্রমবর্ধমান। সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়, জানার পরিধি বাড়ে। তবে সেই বাড়ার সীমা জানা নেই তার নিজেরও। আর এই সীমাটাই তার দীনতার দলিল। আর সীমানাটাও যে অনির্ধারিত, এটাই তার জ্ঞানের সংশয়কে স্পষ্ট করে দেয়। প্রমাণ করে দেয়, তার জ্ঞান অপূর্ণ, দুর্বল ও দ্বন্দ্বঘেরা।

এ হলো বস্তু জগতের অবস্থা– যে জগত সম্পর্কে কিছুটা হলেও জ্ঞান আছে মানুষের। অথচ এই বস্তু জগতের বাইরে এক বিশাল জগত পড়ে আছে, যা কিনা বস্তু জগতের তুলনায় অনেক বিশাল, বিস্তীর্ণ ও ব্যাপ্ত। মানুষের জ্ঞানসীমার বাইরে যে জগত। মানুষ তো এমন, সে তার নিজের প্রকৃত রূপ ও নিগূঢ় সত্তা সম্পর্কেও অজ্ঞ। সে তার আদি অন্ত জানে না। সূচনা শেষ সবই তার জানার বাইরে। এই বিশাল জগতের সূচনা ও সমাপ্তির রহস্য সে উদঘাটন করতে পারেনি। আর আকল ও বিবেক তো নিজের গ্রন্থি-রহস্য সম্পর্কেও বেখবর!

তাছাড়া আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির বিস্তারিত ও দ্বিধাহীন ইলম তার আদেশ ও বিধানসমূহের অকাট্য জ্ঞান শুধু ধারণা অনুমান আর সুস্থ বিবেকের বলে অর্জন করা সম্ভব নয়। আল্লাহর মর্জি সে তো অনেক উর্ধ্বে। যেখানে একজন মানুষ অন্য আরেকজন মানুষের মনের চাহিদা ইচ্ছা ও আবেদন, স্বীয় অনুমান, অভিজ্ঞান ও সুস্থ চিন্তার দ্বারা জানতে পারে না– সেখানে সৃষ্টিকর্তার মর্জি ও সন্তুষ্টির পথ আবিষ্কার করবে কিভাবে?

একইভাবে সে আইন প্রণয়ন, রাজনীতি ও সমাজনীতির শৃঙ্খলা বিধানে ভুরি ভুরি ভুল করে প্রতিদিন। একই বিন্দু থেকে উৎসারিত না হওয়ার ফলে শাসনে শাসনে দ্বন্দ্ব হচ্ছে, আইনে আইনে সংঘাত হচ্ছে। এই দ্বন্দ্ব সংঘাত ক্রমাগত চলছে। লড়াই হচ্ছে জাতিতে জাতিতে। বিভিন্ন স্বার্থ ও স্বপ্নের আবেদনে মুখোমুখি হচ্ছে এক দেশ আরেক দেশের। অকাট্য ও চূড়ান্ত জ্ঞাননির্ভর না হওয়ার কারণে মানবরচিত আইন ও নীতিমালা অভিজ্ঞতা ও নীরিক্ষার ধাপে ধাপে থমকে দাঁড়ায়, বদলায়, কাঁটছাট হয়। তুলনামূলক বিশ্লেষণের বিচারে আদৃত রহিত সমন্বিত হয়। এ এক ধারাবাহিক পরিবর্তন ও রূপান্তরের পথ। বিপ্লব ও সংস্কারের সহস্র শ্লোগান উঠবে, উঠতেই থাকবে। মানুষ নিজের হাতে তৈরি, নিজের ইন্দ্রিয়জাত ও মেধাপ্রসূত আইন ও নীতি দ্বারা পূর্ণ স্বস্তি ও

নিরাপত্তার সন্ধান কোনদিন পায়নি, পাবেও না। মূলত এসব অসঙ্গতি ও সংঘাতের মূল উৎস মানুষের অপূর্ণ ধারণাজাত ইলম। এই অপূর্ণ রুগ্ন ধারণাজাত জ্ঞানের উপর সে ভরসা করেছে বলেই সর্বত্র দ্বন্দ্ব, বিরোধ ও সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছে। এ নিজের প্রতিই তার অবিচার। মানুষের ইলম সম্পর্কে কুরআন বলেছে–

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلا قَلِيلًا ○

তোমাদের খুব সামান্য ইলমই দান করা হয়েছে। *[বনি ইসরাইল : ১৭ : ৮৫]*

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ○

তাদের অধিকাংশ অনুমানেরই অনুসরণ করে আর সত্যের মোকাবেলায় অনুমান কোন কাজে আসে না। তারা যা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। *[ইউনুস : ১০ : ৩৬]*

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ○

তারা তো কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করে; কিন্তু সত্যের মোকাবেলায় অনুমানের কোনই মূল্য নেই। *[নাজম : ৫৩ : ২৮]*

২. কুরআনের বক্তব্য সুনির্দিষ্ট ও বিশদ

দীনের মৌলিক নীতিমালা, মানুষের পরকালীন নাজাত, মুক্তি ও সফলতার পথ অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় দ্ব্যর্থহীন ভঙ্গিতে সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়েছে পবিত্র এই কুরআনে। এতে ইসলাম ও পরকাল সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হয়েছে অত্যন্ত জোরালোভাবে।[১]

---

[১]. স্মরণ রাখতে হবে, দীন ব্যতীত অন্যান্য জ্ঞান বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য কুরআনের আলোচ্য বিষয় নয়। যদি এ সম্পর্কিত কোনো তথ্য বিধৃত হয়, সেটা একান্তই প্রাসঙ্গিক-মূল লক্ষ্য নয়। এসব বিষয়ে বিশদ আলোচনা কুরআনের মূল লক্ষ্য বাহির্ভূত। وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ বা এই জাতীয় আরো যতো আয়াত আছে, ওসবের অর্থ হলো লাওহে মাহফুয এবং আল্লাহর ইলম। তাছাড়া কুরআন শুধু দীনের মৌলিক নীতিমালার কথাই বলেছে। খুঁটিনাটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার বিশদ বর্ণনার কুরআনে বর্ণিত বিধানাবলীর বাস্তব রূপ ও রূপায়নের দায়িত্ব ছিলো হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর

أَفَغَيْرَ اللهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا ۝

বলো, তবে কি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে সালিশ মানবো, যদিও তিনিই তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। *[আনআম : ১১৪]*

وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

অবশ্য আমি তাদের কাছে পৌছে দিয়েছিলাম এমন এক কিতাব, যা পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা বিশদ বিশ্লেষণ করেছিলাম এবং যা ছিল মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য পথ নির্দেশ ও দয়া। *[আরাফ : ৫২]*

الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۝

আলিফ-লাম-রা। এই কিতাব প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞের নিকট থেকে। এর আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট, সুবিন্যস্ত ও পরে বিশদভাবে বিবৃত। *[হুদ : ১]*

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

এই কুরআন আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো রচনা নয়। পক্ষান্তরে এর পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে, এটা তার সমর্থন এবং এটা বিধানসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা। এতে কোন সন্দেহ নেই, এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। *[ইউনুস : ১০ : ৩৭]*

তবে ইসলামে ধর্ম ও দীনের মর্ম খুবই বিস্তীর্ণ উদার। অন্যান্য ধর্মের অনুসারীগণ যেভাবে তাদের ধর্মের মনগড়া সংকীর্ণ ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছে, ইসলামে তার কোন অবকাশ নেই। মানুষ সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্য হলো, মানুষ আল্লাহর গোলাম। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সে আল্লাহর দাস। তার জীবনের একটি

উপর। ইরশাদ হয়েছে– وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ 'আমি আপনার প্রতি কুরআন এই জন্য অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষের সামনে তার বিশ্লেষণ করেন যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ-হয়েছে।'

মুহূর্তও দাসত্বের বাইরে নয়। তার প্রতিটি ক্রিয়াকর্ম এমনকি তার রাজত্বও (যা বাহ্যত দাসত্বের পরিপন্থী মনে হয়) আল্লাহর গোলামীরই বিকাশ মাত্র। আর এ কারণেই ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতিকে আলাদা করে দেখার সুযোগ নেই। এই দাস ও গোলামকে তার মনিব ও প্রভুর পক্ষ থেকে কুরআনের আকারে একটি মৌলিক সংবিধান দেয়া হয়েছে। এই সংবিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে পূর্ণ জীবনটাকেই দাসত্বের ভেতরে কাটানো সম্ভব। এর সাথে কোন রাজনৈতিক পরিশিষ্ট যুক্ত করার প্রয়োজন নেই।

৩. কুরআন : সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বিধানকারী

কুরআনের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো, এটা সত্য-মিথ্যা আর আলো-আঁধারের মধ্যে পার্থক্য বিধানকারী। আর এটা কুরআনের এমন একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য যা তার নামের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে পরিচিত।

ইরশাদ হয়েছে–

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۝

কত মহান তিনি, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকান (সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী) অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্ববাসীর জন্যে সতর্ককারী হতে পারে। *[ফুরকান : ২৫ : ১]*

পবিত্র কুরআন হেদায়াত ও গোমরাহী ঈমান ও কুফর, ইসলাম ও জাহেলিয়্যাত, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি, বিশ্বাস ও ধারণা, হালাল ও হারাম আর আলো ও অন্ধকারের যে চূড়ান্ত বিভাজন ও পার্থক্যরেখা টেনে দিয়েছে, তার কোন উপমা অন্য কোন ধর্মীয় শিক্ষা কিংবা আসমানী গ্রন্থে নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাওহীদ ও শিরকের মাঝে যে স্পষ্ট ফারাক এঁকে দিয়েছে, এ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সংশয়, দুর্বলতা, সন্দেহ করারও কোন পথ খোলা রাখেনি কুরআন। এটা তার একটি উল্লেখযোগ্য মু'জেযা, বিস্ময়কর দিক।

ইরশাদ হয়েছে–

قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۝

নিশ্চয়ই হেদায়াত পথভ্রষ্টতা থেকে আলাদা হয়ে উঠেছে। *[বাকারা : ২ : ২৫৬]*

لِيَمِيزَ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۝

এটা এই জন্য যে, আল্লাহ কুজনকে সুজন থেকে পৃথক করবেন। *[আনফাল : ৮ : ৮৭]*

لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ o

যাতে যে কেউ ধ্বংস হবে, সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট প্রকাশের পর ধ্বংস হয় এবং যে জীবিত থাকবে সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট প্রকাশের পর জীবিত থাকে। আল্লাহ তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। *[আনফাল : ৮ : ৪২]*

৪. কুরআন পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহকে সত্যায়ন করে এবং তত্ত্বাবধানও করে

এ ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় লক্ষ রাখতে হবে–

১. দীনের মৌলিক বিষয়াবলী ও মূলনীতিসমূহ সকল আসমানী গ্রন্থ ও আসমানী শিক্ষায় এক ও অভিন্নরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। এ বিষয়টি কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত।

২. কুরআনের পূর্বে অবতীর্ণ সকল আসমানী সহীফা ছিলো স্ব স্ব কালের জন্য। তাই সংরক্ষিতও ছিলো একটা নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। এর কোনকিছু স্থায়ী ও শাশ্বত ছিলো না, ছিলো না চিরন্তন।

৩. কুরআন হলো এক শাশ্বত চিরন্তন মহাগ্রন্থ। দীনের সকল মূলনীতি রয়েছে এর মধ্যে। মহান এই গ্রন্থ সংরক্ষিত থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত। ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ o

নিশ্চয়ই আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই তার সংরক্ষক। *[আল হিজর : ১৫ : ৯]*

এই মূলনীতি ক'টি মেনে নিলে আমরা সহজেই এ কথা বুঝতে পারি, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলোর জন্য কুরআন হলো একটি সনদ। পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলোর জন্যে এটি মানদণ্ড ও মাপকাঠি। তাই ওসব আসমানী গ্রন্থের যেসব বিষয় ও অংশ কুরআনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সেগুলো সত্য ও সংরক্ষিত, আর যেগুলো বিরোধপূর্ণ সেগুলো অরক্ষিত ও বিকৃত।

কুরআন যে অন্যান্য আসমানী গ্রন্থের জন্যে সত্যায়নকারী– একথা খোদ কুরআনের বহু আয়াতে বিধৃত হয়েছে। যেমন :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ o

আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে। *[মায়িদা : ৫ : ৪৮]*

৫. কুরআন নিরাপদ পথ দেখায় আঁধার থেকে টেনে আনে আলোর দিকে

কুরআনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, কুরআন আলোর পথের নির্দেশক, শান্তি ও নিরাপত্তার পথপ্রদর্শক কুরআন।

ইরশাদ হচ্ছে–

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ o يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ o بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ o

আল্লাহর পক্ষ থেকে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব এসেছে তোমাদের কাছে। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, এর দ্বারা তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন ও নিজ অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন। *[মায়িদা : ৫ : ১৫-১৬]*

الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ o

আলিফ লাম রা। এই কিতাব, আমি এটা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি মানবজাতিকে তাদের

প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বের করে আনতে পারো অন্ধকার থেকে আলোর দিকে– তাঁর পথে, যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসার্হ। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর। *[ইবরাহীম : ১৪ : ১]*

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝

তিনিই তাঁর বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেন তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আনয়ন করার লক্ষ্যে। আল্লাহ তো তোমাদের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু। *[হাদীদ : ৫৭ : ৯]*

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

যারা ঈমান আনে আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোকে নিয়ে যান। আর যারা কুফরী করে, তাদের অভিভাবক শয়তান। সে তাদেরকে আলোক থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়। তারা অগ্নি-অধিবাসী– সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। *[বাকারা : ২ : ২৫৭]*

পবিত্র কুরআন জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সমতল সরল নিঃশঙ্ক ও মধ্যমপন্থা বাতলে দেয়। কুরআন প্রদর্শিত এই পথকে سُبُلَ السَّلَامِ (শান্তির পথ) ছাড়া অন্য কোন শব্দে আখ্যায়িত করা যায় না এবং এই অভিব্যক্তির কোন বিকল্পও নেই। অন্য কোন শব্দ ও বাক্যে এর ব্যাখ্যা করা যায় না। আর এ শান্তির পথগুলো সেই মহান রাজপথ 'সিরাতুল মুসতাকীম' থেকেই উৎসারিত– যেদিকে ইঙ্গিত করে হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۝

এটাই আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা এ পথেরই অনুসরণ করো আর অন্যদের পথের অনুসরণ করো না। তাহলে সে পথ তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। *[আন'আম : ৬ : ১৫৪]*

এখানে কুরআনে কারীমের অলংকারপূর্ণ বর্ণনাভঙ্গি সবিশেষ লক্ষ্যণীয়। কুরআন সর্বদাই 'নূর' এর বিপরীতে 'যুলুমাত' বহুবচন ব্যবহার করেছে। কারণ, কারো জীবনে যদি এক ওহীর আলো না থাকে, কেউ যদি দুর্ভাগ্যবশত ওহীর নূর থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে তার জীবনে আঁধারের আর শেষ থাকে না। মানব জীবনের প্রতিটি পথ ও প্রান্তরই তখন ভরে উঠে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে। বিশুদ্ধতম এই ইসলামের আলোকে যদি আলাদা করা হয় অতঃপর যদি পৃথিবীর দিকে তাকানো হয়, তাহলে সর্বত্রই শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার নজরে পড়বে। নানারূপে, নানা নামে, নানা পরিচয়ে ঢেউ খেলছে মনে হবে অগণিত আঁধার। আলোকিত এই পথটুকু বাদ দিয়ে জীবনের প্রতিটি পাতা নতুন করে পড়ুন। দেখবেন, আল্লাহকে পাওয়ার সব পথ হারিয়ে গেছে; পৃথিবীর সকল ধর্ম কর্মই কিছু অন্ধ রেওয়াজ মাত্র। বিশ্বাসের পরতে পরতে জমে আছে নির্বুদ্ধিতা, বোকামী। চিন্তা-ভাবনার সর্বত্রই অলীক ধারণাদের বসবাস। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রেই ধারণা ও অনুমানের ঠাসাঠাসি অবস্থান। জীবন-যাপন, লেনদেন কোথাও ইনসাফ ও সমতা নেই। আইন ও রাজনীতি ঝুঁকে পড়েছে পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার ভারে আর শাসন ও শাসকদের মূর্তিও অস্তিত্বকে গ্রাস করে রেখেছে অত্যাচার, অবিচার, জুলুম ও সীমালংঘন। কুরআনের ভাষায়–

ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا ۝

অন্ধকারপুঞ্জ স্তরের উপর স্তর, এমনকি সে হাত বের করলে তা আদৌ দেখতে পাবে না। *[নূর : ২৪ : ৩৯]*

জীবনের এই 'আঁধারঘন সমুদ্রে' একমাত্র আলোর মিনার মহান আল্লাহর নূরময় সত্তা। তার আলোকেই রৌশনদীপ্ত আজ আসমান জমিন।

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝

আল্লাহই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি। *[নূর : ২৪ : ৩৫]*

আর এ কারণেই 'যুলুমাত' বহুবচনের বিপরীতে 'নূর' একবচন ব্যবহার করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো, আলোর উৎস একটিই। যদি এই উৎস থেকে আলো উৎসারিত না হয়, তাহলে আর কোত্থেকে আলো আসবে শুনি? এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ۝

আল্লাহ যাকে আলো দান করেননি, তার জন্যে কোন আলো নেই। *[নূর : ২৪ : ৪০]*

যারা কুরআন ও পয়গাম্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে উঠে আসে এই আলোর দিগন্তে, তারা অন্ধকার ও ভুল-ভ্রান্তির বদ্ধ জগত থেকে বেরিয়ে আসে। লাভ করে এক নতুন জীবন। নতুন স্বাদে, নতুন আমোদে নেচে ওঠে তাদের মনপ্রাণ। আচ্ছা, যে ব্যক্তি চোখেই দেখে না, এই জীবনের স্বাদ কী বুঝবে সে? কুরআনের আলো পাওয়ার পর সে বুঝতে পারে, সে এখন চক্ষুষ্মান। জীবনের সকল পথ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তার চোখের সামনে। শান্তির পথ, সরল পথ– সিরাতে মুসতাকিম তার সামনে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। খোদার অলৌকিক আলোকে পথ চলতে শুরু করে। যতক্ষণ এ অলৌকিক আলোকবর্তিকার রৌশনীতে পথ চলে সে, কোন ভ্রান্তি, কোন ভুল তাকে বিভ্রান্ত করতে পারে না, পারে না স্খলিত করতে।

আলো ও অন্ধকার অন্ধ ও চক্ষুষ্মান– এই দুই কাল, এই দুই অবস্থা এক নয়। দু'য়ের মাঝে ফারাক বিস্তর। কুরআন এ দু'য়ের পার্থক্য যেভাবে তুলে ধরেছে, সেভাবে এই সত্যকে তুলে ধরার আর কোন ভাষা নেই। ইরশাদ হয়েছে–

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۝

যে ব্যক্তি মৃত ছিলো, যাকে পরে আমি জীবিত করেছি এবং যাকে মানুষের মধ্যে চলার জন্য আলোক দান করেছি, সেই ব্যক্তি কি ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে অন্ধকারে রয়েছে এবং সেই স্থান থেকে বের হবার নয়। *[আনআম : ১২২]*

যারা কুরআনের অনুসরণ করবে, তাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা সেই নূর ও আলোকের ওয়াদা করেছেন।

ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَآمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। তিনি স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন এবং তোমাদেরকে আলো দান করবেন, যার সাহায্যে তোমরা (পথ) চলবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *[হাদী : ৫৭ : ২৮]*

আর এই আয়াতে বলা হয়েছে– يَمْشِيْ بِهٖ فِي النَّاسِ (সেই আলোকে মানুষের মাঝে চলবে) পূর্বের আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– تَمْشُوْنَ بِهٖ (সেই আলোতে পথ চলবে)। বর্ণনাভঙ্গি ও নির্বাচিত শব্দাবলী এ কথার প্রতিই ইঙ্গিত করছে, এই আলো (নূর) শুধু পরকালের জন্যই নয়; বরং পার্থিব জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মুসলমান এক বিশেষ আলোকপূর্ণ দৃষ্টি ও নূরময় শক্তির অধিকারী হয়। তারা তাদের জীবনের সকল সংকট ও সমস্যা জয় করে ওহীর আলো, রাসূলের নির্দেশনা আল 'ফুরকান'-এর সাহায্যে। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত এই নূর তাদেরকে, তাদের জীবনকে আলাদা করে তুলে পৃথিবীর অন্য সকল বেঈমান– অবিশ্বাসীদের জীবন থেকে। তাদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো, তাদের জ্ঞান ও সিদ্ধান্তের ভিত্তি কোনো অনুমান বা ধারণা নয়; বরং ওহী ও রিসালাতের উপর ভিত্তি করে তারা পথ চলে। বিরল বিস্ময়কর এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করে অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا ۝

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ন্যায় অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি দান করবেন। *[আনফাল : ৭ : ২৯]*

মূলত এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা কুরআনকে নূর, বাসাইর, হুদা, বায়্যিনাহ, মাওইযাহ, শিফা, যিকরুন মুবারাক ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করেছেন।

৬. কুরআন : একটি স্বচ্ছ দর্পণ

কুরআনে কারীম একটি স্বচ্ছ আয়না। যে কোন বিশ্বাস চিন্তা চরিত্র ও আমলের লোকেরা চাইলেই এর মধ্যে নিজেদের চেহারা দেখতে পাবে। কোথাও ইঙ্গিতে, কোথাও পরিষ্কার ভাষায়, কোথাও অতীতকালের বিভিন্ন জাতির, কোথাও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিসত্তার চিত্র অংকিত হয়েছে অতীব যত্নের সাথে। আবার কোথাও বা সরাসরি এই পাঠকদের চিত্রই ফুটে উঠেছে দিবসের সূর্যের মতো স্পষ্টভাবে।

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

আমি তোমাদের প্রতি এমন এক কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমাদের আলোচনা রয়েছে। তোমরা কি বুঝো না?[১] *[আম্বিয়া : ২১ : ১০]*

জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর বিশিষ্ট ছাত্র শাইখুল ইসলাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে নাসর মারওয়াযী বাগদাদী (২০২-২৯৪হি.) (রহ.) তদীয় বিখ্যাত গ্রন্থ 'কিয়ামুল লাইল'-এ একটি চমৎকার শিক্ষণীয় ঘটনা লিখেছেন। উল্লিখিত আয়াতটির মর্ম উপলব্ধিতে এই ঘটনাটি বিশেষ সাহায্য করতে পারে। তাছাড়া এর মধ্যে অতীতকালের মনীষীগণ কিভাবে কুরআনকে বুঝতে চেষ্টা করতেন, কুরআন সম্পর্কে কতটা ভাবতেন, তাও সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

মর্যাদাবান তাবি'ঈ আরব গোত্রপতি হযরত আহনাফ ইবনে কায়স (রহ.)[২] একদিন বসে আছেন। তার সামনেই এক ব্যক্তি তেলাওয়াত করলো–

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

আমি তোমাদের প্রতি এমন এক গ্রন্থ নাযেল করেছি, যাতে তোমাদের আলোচনা রয়েছে, তোমরা কি বুঝো না? *[আম্বিয়া : ২১ : ১০]*

আয়াতটি শুনতেই চকিত হলেন তিনি। বললেন, একটি কুরআন মাজীদ আনো তো দেখি, আমাদের আলোচনা কোথায়? দেখি, আমি কাদের সঙ্গে আছি। কাদের সঙ্গে আমার মিল পড়েছে। খুলে বসলেন পাক কালাম। দেখলেন, এক শ্রেণীর আলোচনা জ্বলজ্বল করছে। তাদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে–

كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝

তারা রাতের সামান্য অংশই নিদ্রায় কাটাতো। রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতো এবং তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের হক। *[যারিয়াত : ৫১ : ১৭-১৯]*

---

১. আয়াতে উল্লেখিত যিকর শব্দটির অর্থ হযরত ইবন আব্বাস (রা.) 'শরফ' অর্থাৎ মর্যাদা দিয়ে করেছেন আর মুজাহিদ (রহ.) করেছেন 'তাযকিরাহ' বা আলোচনা দ্বারা। [ইবন কাছীর]

২. জন্ম হিজরতের পূর্বে। মৃত্যুঃ ৭২ হি.। বনু তামীমের সর্দার ধী ও বুদ্ধিমত্তায় উপমাময়। ইরান বিজেতাদের অন্যতম। হযরত্ আলী (রা.) এর সাথে বিশেষ সম্পর্ক ছিলো।

তিনি অগ্রসর হলেন। আরো কিছু লোকের কথা নজরে পড়লো। তাদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে–

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝

তারা শয্যা ছেড়ে স্বীয় প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশংকায় এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দান করেছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে। *[আস-সাজদা : ৩২ : ১৬]*

তারপর দৃষ্টি পড়লো আরেকটি শ্রেণীর উপর। তাদের অবস্থা হলো–

يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۝

তারা তাদের প্রভুর সমীপে সিজাদবনত কিংবা দণ্ডায়মাণ অবস্থায় রাত অতিবাহিত করে। *[ফুরকান : ২৫ : ৬৪]*

আরো অগ্রসর হলেন। কিছু লোক সামনে পড়লো। কুরআন তাদের সম্পর্কে বলেছে–

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ
عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

যারা স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে, যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের ভালোবাসেন। *[আলে-ইমরান : ৩ : ১৩৪]*

তারপর সাক্ষাৎ হলো যাদের সঙ্গে, তাদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে–

يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

তারা অন্যদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয়, নিজেরা অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও। যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম। *[হাশর : ৯]*

তারপর দেখা হলো যাদের সঙ্গে, তাদের চরিত্র সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে–

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ
يَغْفِرُونَ ۝

যারা তাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়, যথাযথভাবে নামায আদায় করে, পরস্পর পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দান করেছি, তা থেকে ব্যয় করে। *[শুরা : ৪২ : ৩৭]*

এখানে এসে হযরত আহনাফ ইবনে কায়েস (রহ.) থমকে দাঁড়ালেন। বললেন- আল্লাহ গো! আমি তো আমার সম্পর্কে সম্যক অবগত। আমি তো এদের কারো দলেই নেই। এবার হযরত আহনাফ (রহ.) ভিন্ন পথ ধরলেন। কিছু লোকের সাথে সাক্ষাৎ হলো, যাদের অবস্থা সম্পর্কে কুরআন বলেছে-

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ ٥

তাদের অবস্থা হলো, যখন তাদেরকে বলা হতো- আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তখন তারা অহংকার করতো আর বলতো, আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের মাবুদদেরকে বর্জন করবো? *[সাফফাত : ৩৭ : ৩৫-৩৬]*

তারপর যাদের মুখোমুখি হলেন তাদের অবস্থা হলো এই-

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ٥

শুধু এক আল্লাহর কথা বলা হলে যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয়ে পড়ে এবং আল্লাহর পরিবর্তে অন্য উপাস্যগুলোর উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়। *[যুমার : ৩৯ : ৪৫]*

তারপর অতিক্রম করলেন এমন কিছু লোকের পাশ দিয়ে, যাদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে-

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ۝ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ۝ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ۝ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ۝ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ۝ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ ٥

তোমাদেরকে কিসে দোযখে নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে, আমরা মুসল্লীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না, অভাবগ্রস্তদের আহার্য

দান করতাম না, বিভ্রান্তিমূলক আলোচনাকারীদের সাথে বিভ্রান্তিমূলক আলোচনায় নিমগ্ন থাকতাম। আমরা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করতাম- আমাদের কাছে মৃত্যুর আগমন পর্যন্ত। *[মুদ্দাছছির : ৭৪ : ৪২-৪৭]*

এখানে এসেও তিনি কিছুক্ষণ নির্বাক দাঁড়িয়ে রইলেন। অতঃপর কর্ণকুহরে অঙ্গুলি স্থাপন করে বলে উঠলেন- হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই। আমি এদেরও দলভুক্ত নই, এদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

হৃদয়ে তার অস্থির ঝড়। একের পর এক পাতা উল্টে যাচ্ছেন। নিজেকে খুঁজে ফিরছেন পাক কালামে।

অবশেষে এই আয়াতের সামনে এসে চোখ স্থির হয়ে রইলো-

وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥

এবং অপর কিছু লোক নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে, তারা সৎকর্মের সাথে অসৎ কর্ম মিশ্রিত করেছে; আল্লাহ হয়তো তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *[তাওবা : ১০২]*

এখানে এসে তিনি আবেগে-উচ্ছ্বাসে অলক্ষ্যে চিৎকার করে উঠলেন- হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই এই তো আমার অবস্থা। এই তো পেয়েছি আমাকে।

৭. কুরআনের একটি মুজেযা : বিভিন্ন জাতি ও ব্যক্তির স্থায়ী ও স্বাভাবিক আমল ও সমস্যাগুলোর বর্ণনা

এটাও কুরআনে কারীমের একটি অলৌকিক দিক। কুরআন মাজীদ বিভিন্ন জাতি ও ব্যক্তির আলোচনার সময় কেবল সেইসব জাতি ও ব্যক্তিকেই ঠাঁই দিয়েছে, যারা তাদের কর্ম ও চরিত্রের কারণে চিরন্তন ও অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। আর অপরাধের ক্ষেত্রেও বিরল দুষ্প্রাপ্য ঐসব অপরাধ ও ব্যাধির আলোচনা করেনি, যা মানুষ শত শত বছর স্বীয় পাপাচারী মেধা ও চিন্তা ক্ষয় করে আবিষ্কার করেছে। কুরআন বরং সেইসব ব্যাধির কথাই বলেছে, যেগুলো সচরাচর ও অহরহ ঘটে থাকে। এসব তত্ত্ব ও বাস্তবতার আলোকেই পবিত্র কুরআন একটি চিরন্তন ও শাশ্বত গ্রন্থ হিসেবে উত্তীর্ণ ও প্রতিষ্ঠিত। এতে অতীত বর্তমান আর নতুন পুরানের কোনো বিভাজন নেই। এর পয়গাম সকল কাল, সকল সভ্যতার

জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। তার ডাক সদা তরুণ, সদা সবুজ, সদা প্রাণবন্ত। সকল কাল, ক্ষেত্র ও স্থানের জন্যই মানানসই যথার্থ উপযুক্ত। কুরআন মানবমণ্ডলীর এক সমন্বিত উচ্চারণ, মানব চিন্তা ও স্বভাবের এক স্বচ্ছ দর্পণ। কুরআনে কারীম সম্পর্কে তাঁর অবতারণকারী যথার্থই বলেছেন–

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ০

আমি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াত, যা তোমাদের পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত এবং মুত্তাকীদের জন্যে উপদেশ। *[নূর : ৩৯ : ৩৪]*

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ০

আমি এই কুরআনে মানুষের জন্যে সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। *[যুমার : ২৭]*

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ০

তাদের বৃত্তান্তে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্যে রয়েছে শিক্ষা। এটা এমন বাণী, যা মিথ্যা রচনা নয়। কিন্তু মুমিনদের জন্যে এটা পূর্ববর্তী গ্রন্থে যা আছে, তার সমর্থন এবং সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, হেদায়াত রহমত। *[ইউসুফ : ১২ : ১১১]*

কুরআনের অলৌকিকতা

কুরআন একটি মুজেযা। এই দাবি করেছে খোদ কুরআন। যারা 'কুরআন আসমানী কিতাব এবং ইলাহী গ্রন্থ' এ বিষয়ে সন্দেহ করেছে, কুরআনই তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছে। মোকাবেলা করার দাওয়াত দিয়েছে। প্রথমে চ্যালেঞ্জপূর্ণ এই আয়াতগুলো একত্রিত করে পড়ুন।

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ০

আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি, তাতে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে, তাহলে তোমরা এর অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন করো এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তাহলে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান করো। *[বাকারা ২ : ২৩]*

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ০

তারা কি বলে, সে (হযরত মুহাম্মদ সা.) এটা রচনা করেছে? বলো, তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা আনয়ন করো এবং আল্লাহ ব্যতীত অপর যাকে পার আহ্বান করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। *[ইউনুস : ১০ : ৩৮]*

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ০ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ০

তারা কি বলে, মুহাম্মদ এটা রচনা করেছে? বলো, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে এর মতো দশটি স্বরচিত সূরা

আনয়ন করো এবং আল্লাহ ব্যতীত অপর যাকে পারো ডেকে লও। যদি তারা তোমাদের আহ্বানে সাড়া না দেয়, তবে জেনে রাখো, এটা আল্লাহর ইলম মুতাবিক অবতীর্ণ এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোনো মা'বুদ নেই। সুতরাং তোমরা আত্মসমর্পণকারী হবে কি? *[হুদ : ১১ : ১৩-১৪]*

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ○

বলো, যদি কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় এবং যদি তারা পরস্পরকে সাহায্য করে, তবুও তারা এর অনুরূপ আনয়ন করতে পারবে না। *[বনি ইসরাইল : ১৭ : ৮৮]*

قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ○ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ○

বলো, তোমরা সত্যবাদী হলে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন কিতাব আনয়ন করো, যা পথনির্দেশে এতদুভয় (তাওরাত ও কুরআন) থেকে উৎকৃষ্ট হবে; আমি সে কিতাব অনুসরণ করব। অতঃপর তারা যদি তোমার আহ্বানে সাড়া না দেয়, তাহলে মনে করবে, তারা কেবল তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করে। আল্লাহর পথনির্দেশ অগ্রাহ্য করে যে ব্যক্তি খেয়াল খুশির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক বিভ্রান্ত আর কে আছে? নিশ্চয়ই আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। *[কাসাস : ২৮ : ৪৯-৫০]*

কুরআন : অলৌকিকতার কয়েকটি দিক

উল্লিখিত আয়াতগুলোতে সন্দেহবাদী আর মুশরিকদের কুরআনের অনুরূপ কোন গ্রন্থ বা সূরা আনয়ন করতে বলা হয়েছে। আর কোন রচনা বা গ্রন্থ কুরআনের অনুরূপ হতে হলে তার মধ্যে কুরআনের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য অবশ্যই থাকতে হবে। থাকতে হবে বৈশিষ্ট্য ও অলৌকিকতার সকল দিক। কারণ কুরআন শুধু শব্দ চয়ন, বাক্য বিনাস, সাহিত্য রস, শিল্প অলংকার আর ভাষাতত্ত্বের বিচারেই অলৌকিক নয়; বরং ভাব, তথ্য, উচ্চতর চিন্তা-দর্শন, অদৃশ্য জ্ঞান ও চিরন্তন নির্দেশনার বিচারেও এক জ্বলন্ত মু'জেযা। তাছাড়া যে ধর্ম-দর্শন কুরআন উপস্থাপন করেছে, তার আদর্শ চিন্তা চরিত্র সামাজিক ও নাগরিক রূপের বিচারেও মু'জেযা। মু'জেযা তার প্রতিফলিত ব্যাপকতর প্রভাব ও সংগ্রামের বিচারে। মু'জেযা তার ভবিষ্যদ্বাণী ও প্রদত্ত সংবাদের নিরিখেও। কিন্তু বিশাল এই অলৌকিকতার একটি মাত্র দিক– তার ভাষাশৈলীর অলৌকিকতাকেই যখন তারা মোকাবেলা করতে পারলো না, তখন আর ব্যাপকতর বিচারে কুরআনের মোকাবেলা করার কি কোন মুখ থাকে? না সম্ভব?

সূরা হুদ (রুকু ২)-এর ভাষ্য দ্বারা প্রতীয়মান হয়, কুরআনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও তার অলৌকিতার মুখ্য রহস্য হলো, এই গ্রন্থ 'আল্লাহর ইলম মুতাবিক' অবতীর্ণ হয়েছে। মূলত কুরআন হলো আল্লাহ তায়ালার ইলম ও জ্ঞানের বিশেষ এক বিকাশ। তাই মানুষ তার ধারণা, অনুমান ও দ্বন্দ্বপীড়িত দীন ও সীমিত জ্ঞানের দ্বারা এই মহাজ্ঞানের মোকাবেলা করবে কিভাবে? কারণ, মানুষ যেভাবে আল্লাহর অন্য কোনো গুণ ও বৈশিষ্ট্যের তুলনা পেশ করতে অক্ষম, তেমনি ইলাহী জ্ঞানের অনুরূপ উপস্থাপনেও ব্যর্থ, অক্ষম– এই তো স্বাভাবিক। ইরশাদ হয়েছে–

فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ○

যদি তারা তোমাদের আহ্বানে সাড়া না দেয়, তবে জেনে রেখো, এটা আল্লাহর ইলম মুতাবিক অবতীর্ণ এবং তিনি

ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। সুতরাং তোমরা কি আত্মসমর্পণ করবে না? *[হূদ : ১১ : ১৪]*

أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللهِ (আল্লাহর ইলম মুতাবিক অবতীর্ণ) এ কথা বলে আল্লাহ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, মা'বুদ হিসেবে তিনি যেমন তাঁর সকল গুণাবলীতে অদ্বিতীয় লা-শরীক, তেমনি তাঁর ইলমও অদ্বিতীয়– লা-শরীক। তাঁকে ব্যতীত যেমন কোন মাবুদ নেই, তেমনি তাঁর অমর গ্রন্থ কুরআনের জবাব দেয়ার মতোও কেউ নেই। থাকতে পারেও না।

وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○

অবশ্য আমি তাদেরকে পৌছে দিয়েছিলাম এমন এক কিতাব, যা পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা বিশদ ব্যাখ্যা করেছিলাম এবং যা ছিলো মুমিন সম্প্রদায়ের জন্যে পথ নির্দেশ ও দয়া। *[আরাফ : ৭ : ৫২]*

ইলমের সম্পর্ক শুধু শব্দ ও বাক্য বিন্যাসের সঙ্গেই নয়; বরং মর্ম এবং তত্ত্বও ইলমের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই কুরআন তার শব্দগত শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতা বিকাশের জন্য قُرْآنًا عَرَبِيًّا كِتَابٍ مُبِينٍ এবং لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ইত্যাকার শব্দ ব্যবহার করেছে, যাতে তার ভাষাগত সৌকর্য আর সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে উঠেছে। যেমন–

الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ○

আলিফ-লাম-রা'। এ হলো উজ্জ্বল গ্রন্থের আয়াতসমূহ। আমি নিশ্চয়ই এই কুরআনকে আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পারো। *[ইউসুফ : ১২ : ১]*

لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ○

তারা যার প্রতি এটা আরোপ করে, তার ভাষা তো অনারবী। কিন্তু কুরআনের ভাষা তো স্পষ্ট আরবী ভাষা। *[নাহল : ১৬ : ১০৩]*

সূরা কাসাসে (রুকু : ৫) কুরআনের এমন কোনো তুলনা আনয়ন করতে বলা হয়েছে, যা হেদায়াত দিক নির্দেশনা ও সংশোধনের বিচারে কুরআনের চাইতে উৎকৃষ্ট হবে।

قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○

বলো, তোমরা সত্যবাদী হলে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো একটি কিতাব আনয়ন করো, যা পথ নির্দেশে এতদুভয় (তাওরাত ও কুরআন) থেকে উৎকৃষ্ট হবে। আমি সেই কিতাব অনুসরণ করবো। *[কাসাস : ২৮ : ৪৯]*

অতএব, আল কুরআনের ভাষাগত অলৌকিকতা, বিস্ময়কর সাহিত্য শিল্প কুরআনের অলৌকিকতার একটা দিক মাত্র। এটাই তার একমাত্র অলৌকিক দিক নয়। প্রাচীনকালের মুসলিম গবেষকগণ যখন কুরআনের অলৌকিকতা সম্পর্কে ভেবেছেন, এ বিষয়ে কলম ধরেছেন, তখন কালের সাধারণ স্বভাব, আরবদের সাহিত্যিক মন, শিল্প চিন্তা ও ভাষার গুরুত্বের বিচারে এ দিকটাই সর্বাধিক বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে তাদের রচনায় ও বর্ণনায়। এ বিষয়ে তারা যে পূর্ণ দক্ষতা ও অসাধারণ তীক্ষ্ণতার পরিচয় দিয়েছেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। তারা মন, মগজ ও বিশ্বাসকে উজাড় করে দিয়ে এ বিষয়ে তথ্য ও তত্ত্বের যে প্রাচুর্য প্রদর্শন করেছেন, তাতে আর নতুন করে কিছু যুক্ত করার অবকাশ নেই। এ বিষয়ে কিছু জানতে চাইলে এখন তাদের সেইসব কালজয়ী রচনাবলীর দ্বারস্থ হতে হবে।[১]

---

১. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : আল্লামা আবু বরক বাকিল্লানী ও ইবনুল আরাবীর ই'জাযুল কুরআন, আল্লামা রুম্মানীর পুস্তিকা আন-নুকাত ফী ইজাযিল কুরআন, বালাগাত ও বয়ানের মুজতাহিদানা প্রাচীন গ্রন্থ– ইমাম আবদুল কাহির জুরজানীর দালাইলুল ই'জায, আসরারুল বালাগাহ, পরবর্তীকালের মনীষীদের মধ্যে আমীরুল মুমিনীন ইয়াহইয়া ইয়ামানীর কিতাবুত তিরায। তাছাড়া তাফসীর গ্রন্থাবলীর মধ্যে আল্লামা জারুল্লাহ যামাখশারীর তাফসীরে কাশশাফ, নাহ্ মাআনী ও বয়ানের ক্ষেত্রে হাফিজ ইবন কায়্যিমের আল-ফাওয়াইদুল মাশুকাহ লিলকুরআন এ বিষয়ে অত্যন্ত তথ্যবহুল সূত্র। সমকালীন আলেমগণের মধ্যে আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ দাররা এর আন নাবাউল আযীমও (১-২) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আল-কুরআনের সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ মু'জেযা পবিত্র ইসলাম

কুরআনে কারীম এই পৃথিবীর সামনে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ও বিশ্বাসের শাশ্বত হেদায়াতপত্র পেশ করেছে। পৃথিবী এর পূর্বে এর চেয়ে অধিক বিশদ বর্ণনাপূর্ণ, অকাট্য ও বাস্তবধর্মী 'হেদায়াতনামা' ধর্মগ্রন্থ আর কখনো দেখেনি। ইতিপূর্বে আগত সকল ধর্মগ্রন্থই (যেহেতু সেগুলো বিশেষ কাল ও অঞ্চলের জন্য নির্দিষ্ট ছিলো) এর তুলনায় অসম্পূর্ণ ও দুর্বল ছিলো। কুরআন সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ তাই কুরআন সর্বশেষ হেদোয়াতনামাও। মানুষকে তার সৃষ্টিকর্তার সাথে ঘনিষ্ঠ করে তুলতে, মানবজীবনে রুহানিয়্যাত ও লিল্লাহিয়্যাত সৃষ্টি করতে, সকল প্রকার ভ্রষ্টতা ও স্খলন থেকে রক্ষা করতে, মানুষ যুগে যুগে যেসব কুসংস্কার ও ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলো এবং আছে, তার অন্ধকার গহবর থেকে মুক্ত করতে কুরআনের চেয়ে কার্যকর ও সফল কোনো গ্রন্থের কথা মানুষ ভাবতে পারে কি?

এই কুরআন মানবজাতিকে একটি উচ্চতর আখলাকী আসমানী তামাদ্দুনিক জীবনবিধান দান করেছে– যার যথার্থ অনুসরণে এই পৃথিবীতে নিশ্চিতভাবে উন্নততর চারিত্রিক ও সামাজিক ফসল উৎপাদন করা সম্ভব। এ শুধু সম্ভাব্যতার মধ্যেই সীমিত নয়; বরং বাস্তবে করেও দেখিয়েছে এবং এর উপমা আজ পর্যন্ত অন্য কোনো ধর্ম শাস্ত্র উপস্থাপন করতে পারেনি। আজ অবধি মানব সমাজে যতো রকমের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে কিংবা কেয়ামত পর্যন্ত যতো সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে, পবিত্র কুরআন অত্যন্ত অলৌকিকভাবে বিন্দু বিন্দু ইশারা ইঙ্গিতের মাধ্যমে ওসব সমস্যার সমাধান করে দেয়।

কুরআন এমন সব মূলনীতি ও মৌলিকশিক্ষা উপহার দিয়েছে মানবজাতিকে– যার ভিত্তিতে যে কোনো কালে যে কোনো স্থানে উন্নত সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। সর্বদা সর্বত্রই মানব জীবনকে নতুন আদলে ও নতুন প্রাণে নির্মাণ করা সম্ভব। যেহেতু মহান এই কালাম আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, তাই মানুষ আইন ও বিধান নির্মাণে যেসব ভুল ত্রুটি করে থাকে, এই গ্রন্থ তা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। এতে কোনো দীনতা, দুর্বলতা, অনুমান ও ধারণাকেন্দ্রিক বিচ্যুতি নেই। কুরআন যেহেতু সর্বশেষ গ্রন্থ, তাই তাতে বর্ধন, সংযুক্তি ও সম্পূরণের কোনো প্রয়োজন ও সুযোগ নেই।

যেহেতু এই কিতাব বিশ্ব জাহানের জন্যে অবতীর্ণ, তাই তাতে জাতি-গোষ্ঠি ও আঞ্চলিকতার কোনো গন্ধ নেই। কুরআন যেহেতু স্থায়ী, চিরন্তন ও চূড়ান্ত তাই

তাতে রহিতকরণ, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের কোনো ছিদ্র নেই। পূর্ণ কামেল মুকাম্মাল বলে বাড়তি কিছু যোগ হওয়ার আবিলতা থেকে সম্পূর্ণ পাক ও স্বাধীন। ইরশাদ হয়েছে–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا ۝

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করে দিলাম এবং আমার নেয়ামতসমূহ তোমাদের প্রতি পরিপূর্ণ করে দিলাম আর ইসলামকে তোমাদের জন্যে দীন হিসেবে মনোনীত করলাম। *[মাইদা : ৫ : ৩]*

কুরআন মানবজাতিকে এক পরিপূর্ণ জীবন-বিধান দান করেছে। কিন্তু এই জীবন-বিধান বাস্তবায়ন করতে গেলে ঐসব সমস্যা ও সংকটের মুখোমুখি হতে হয় না, যেসব সংকট ও সমস্যা হাজার হাজার বছর ধরে মানব শ্রেণীর চিন্তাবিদ ও সমাজ বিজ্ঞানীদের মস্তিষ্ককে ব্যস্ত করে রেখেছে। আর জীবন দিয়েও তার শেষ ও চূড়ান্ত সমাধান আবিষ্কার করতে পারেনি।

তাছাড়া এমন অনেক সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট আছে, যা যাপিত ভুল সমাজ ও পরিবেশের সৃষ্টি। হাজার বছরের ধারাবাহিক ভুল ও অভিজ্ঞতার পর পৃথিবীর চিন্তাবিদ ও গবেষকরা যে ফলাফল আবিষ্কারে তৃপ্তির ঢেকুর তোলে, তেরশ' বছর পূর্বে এক নিরক্ষর ব্যক্তির কণ্ঠে অত্যন্ত সরল ভাষায় তা উচ্চারিত হয়েছে। মূলত এই হেদায়েতপত্র ও জীবন বিধান যার নাম ইসলাম মহান আল্লাহর অপার কৌশল ও প্রজ্ঞার এক শ্রেষ্ঠতর সৃষ্টি ও নমুনা।

صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۝

এটা আল্লাহর শিল্প। তিনিই প্রতিটি জিনিসকে মজবুত করেছেন। *[নামল : ২৭ : ৮৮]*

ইসলামের নীতিমালা ও মৌলিক আদর্শ দর্শন যেহেতু কুরআন থেকেই চয়িত, গৃহীত তাই কুরআনই পৃথিবীর সামনে ইসলামকে উপস্থাপন করেছে। তাই ইসলাম কুরআন নিবেদিত একটি জীবন্ত মু'জিযা।

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

তিনিই নিরক্ষরদের মাঝে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন তাদেরই মধ্য থেকে যিনি তাঁর আয়াতসমূহ তাদের সামনে তেলাওয়াত করেন, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন; ইতোপূর্বে তো তারা ছিলো ঘোর বিভ্রান্তিতে। *[জুমুআ : ৬২ : ২]*

কুরআনে কারীমের এই মুজেযার ব্যাখ্যা ও তার বিভিন্ন দিক তুলে ধরার অর্থ ইসলামের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা তুলে ধরা। আর ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যার জন্যে তো বর্ণাঢ্য একটি লাইব্রেরীও যথেষ্ট নয়। অবশ্য এর কোনো কোনো অলৌকিক দিক সম্পর্কে যথাস্থানে আলোচনা করা হবে। 'আকায়েদ' অধ্যায়ে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের অলৌকিক গঠনরূপ, বিস্ময়কর পূর্ণতা, আখলাক ও সামাজিক অঙ্গনে কুরআনের সারগর্ভ তত্ত্ব ও প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষা এক বিস্ময়কর ভাবনার বিষয়। কিন্তু এর পূর্ণ রহস্য, গভীর তত্ত্বাবলী গণনা করা, একত্রিত করে উপস্থাপন করা, তার অলৌকিক সৌন্দর্য-বিভাকে একটি ফ্রেমের ভেতর বন্দী করে উপস্থাপন করা কোনোকালে কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম আর সমুদ্র যদি কালি হয় এবং তার সাথে আরো সাত সমুদ্র যুক্ত হয়, তবুও আল্লাহর বাণী নিঃশেষ হবে না। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। *[লুকমান : ৩১ : ২৭]*

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝

'বলো' আমার প্রতিপালকের কথা লেখার জন্য যদি সমুদ্র কালি হয়, তবু আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র শেষ হয়ে যাবে। আমরা এর সাহায্যার্থে এর অনুরূপ আরও সমুদ্র যদিও নিয়ে আসি, তবুও। *[কাহফ : ১৮ : ১০৯]*

কুরআনের দ্বিতীয় মু'জেযা অসামান্য তত্ত্ব ও তথ্য

কুরআনের অলৌকিকতার দ্বিতীয় প্রধান দিক হলো, তার অগাধ অসামান্য জ্ঞান তত্ত্ব তথ্য নিগূঢ় রহস্য ও সূক্ষ্ম নির্দেশনাসমূহ, যা এই মহাগ্রন্থের মধ্যে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। যার প্রতিটি কণিকাই একটি স্বতন্ত্র মুজেযা। মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান যতোই উন্নতি সাধন করবে, মানুষের দৃষ্টি যতো ধারাল ও শক্তিশালী হবে, আবিষ্কার উন্মোচনের পথে মানুষ যতোই অগ্রসর হবে; কুরআনের সৌন্দর্য তার সামনে ততোই উদ্ভাসিত হতে থাকবে। মূলত মানুষর উপলব্ধি ও স্বরূপ খুবই সংকীর্ণ। কুরআনের ব্যাপক বিস্তীর্ণ মর্ম ও রহস্য ধারণ করার ক্ষমতা তার নেই। তারপরও ছিটে ফোঁটা যায় কিছু ভাগ্যে জুটে যায়, তাই কপাল।

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا ۝

তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, ফলে উপত্যকাসমূহ নিজ নিজ পরিমাপ মুতাবিক প্লাবিত হয়। *[রাদ : ১৩ : ১৭]*

এসব মু'জেযার প্রতিটির মধ্যেই অলৌকিকতার বিভিন্ন দিক রয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো– কুরআন প্রদত্ত প্রতিটি তথ্যই চিরন্তন, শাশ্বত ও চূড়ান্ত। অকাট্য এর প্রতিটি ইঙ্গিত। এটা আল্লাহর ইলম ও আল্লাহ প্রদত্ত কিতাবের প্রধান বৈশিষ্ট্যও। আর মানুষের জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হলো, সংশয় ও পরিবর্তন। যেহেতু কুরআন পরিপূর্ণভাবেই সংরক্ষিত, তাই তার প্রতিটি তথ্য তত্ত্ব ও মর্মই সংরক্ষিত। তার বক্তব্যের প্রতিটি কণিকাই অকাট্য ও দ্বিধামুক্ত।

প্রাচীনকালের ধর্মগ্রন্থগুলোতে মানবিক জ্ঞানের মিশ্রণ

ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থে যখন মানুষের হস্তক্ষেপ শুরু হয়, তখন আর ধর্ম কর্ম ও ধর্মগ্রন্থ রক্ষিত থাকে না। বরং তাতে অবাঞ্ছিত এমন অনেক কিছুই এসে যুক্ত হয়, যা থেকে সেই ধর্মকে রক্ষা করার দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আর গ্রহণ করা হয় না। তখন ওই ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থ মানবরচিত জ্ঞান, চিন্তা ও দর্শনে ভরে ওঠে, ফুলে ওঠে। আর মানুষের জ্ঞান যেহেতু অরক্ষিত, ধারণাপ্রসূত ও সীমাবদ্ধ, তাই তখন আর ওই ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থকে অকাট্য, শাশ্বত ও রক্ষিত বলা যায় না।

পবিত্র কুরআন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অকাট্য ও চিরন্তন। এতে মানুষের পরিবর্তনশীল চিন্তা, দর্শন, গবেষণা ও অভিজ্ঞতার কোনো কালিমা যুক্ত হয়নি। এই গ্রন্থ সম্পূর্ণরূপেই রক্ষিত।

পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের যতোই উন্নতি হোক, পদার্থ আর জ্যোতির্বিদ্যা উৎকর্ষের যে রূপই ধারণ করুক, পৃথিবী সকল গ্রহ নক্ষত্রের কেন্দ্রবিন্দু প্রমাণিত হোক কিংবা সূর্য, পৃথিবী সমতল ক্ষেত্র হিসেবে প্রমাণিত হোক কিংবা ডিম্বাকৃতির, জগতসমূহের বহু সংখ্যা প্রমাণিত হোক না হোক; কুরআনের তত্ত্ব তথ্য যেমন আছে, তেমনি থাকবে। কুরআনের জ্ঞান স্থির ও রক্ষিত।

পক্ষান্তরে 'বাইবেল' মানুষের হাত থেকে বাঁচতে পারেনি। পরিবর্তন ও গবেষণার শক্ত নখর তাকে খাবলে ধরেছে। মানুষের সাধারণ বিশ্বাস পরিচিত চিন্তা দর্শন সবই জায়গা করে নিয়েছে ধর্মগ্রন্থের পাক জমিনে। তার দৃষ্টিতে পৃথিবীর বয়স ছয় হাজার বছর। পৃথিবী একটি চেপটা পাটাতনের মতো। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ স্পন্দনশীল ও চলমান। জগতের কেন্দ্রবিন্দু পৃথিবী। অবশিষ্ট সৌরজগত তার অধীন। পৃথিবীর অপর পিঠে আবাদীর কোন সুযোগ নেই। এজন্যই স্যান্ট অগস্টাইন বলেছেন– হযরত আদম (আ.)-এর সন্তানদের কেউ অবশ্য এমন কথা আর বলেনি। পৃথিবী যে ডিম্বাকৃতির নয় তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, ওই দিকের বাসিন্দাগণ হাশরের দিন আল্লাহ তায়ালা যে হাওয়া থেকে জমিনে অবতরণ করবেন, সেটা কিভাবে দেখবে?

ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক 'ইলহামী' তত্ত্ব সম্ভবত 'মুকাদ্দাস গ্রন্থের' লেখক ও ব্যাখ্যাতাগণের উর্বর হাতের ফসল। তারা তাদের কালের বিখ্যাত ও সর্বজনসম্মত চিন্তা মুতাবিক এসব তথ্যকে যুক্ত করে দিয়েছেন। তাই বলে সেটা

বাস্তবসম্মত হবে, তা তো আর জরুরি ছিলো না। এটা ছিলো মানবীয় জ্ঞানের একটা ষ্টেশন। আর মানুষের জ্ঞান তো স্থায়ী ও স্থির নয়। সদা চলন্ত মুসাফিরের মতো মানুষের জ্ঞান। সে যতোই সম্মুখে অগ্রসর হয়, পেছনের জানাকে পেছনেই রেখে আসে। তাই একসময় এসে ধর্ম ও বিবেকের সহঅবস্থান অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আর এটাই ছিল ধর্ম ও বিজ্ঞানের সংঘাতের মূল কাল এবং ইউরোপে ধর্ম পতনের প্রথম দিবসও। অথচ ইসলামের ইতিহাসে নিশ্চিতভাবেই এমন দিনের উদয় হয়নি। আর হবেও না। মানুষের জ্ঞান পরস্পর বিরোধী হয়, হতে পারে। এতে একটা শুদ্ধ অপরটা ভুল হয়। এমনকি উভয়টিই ভুল হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার মহাগ্রন্থ পরীক্ষিত। তত্ত্ব তথ্য ও বর্ণনায় কোনরূপ সংঘাত নেই। বরং এক এই রক্ষিত শাশ্বত চূড়ান্ত জ্ঞানের আধার। তাই যে কোনো জ্ঞান ও তথ্য এই গ্রন্থের সাথে সংঘাতপূর্ণ হবে, সেটা যে সত্য নয় এটা নিশ্চিতভাবে সত্য।

আধুনিক বিজ্ঞান ও গবেষণার সত্যায়ন

কুরআনে কারীমের মধ্যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক সায়েন্টিফিক তথ্য অনুসন্ধান, অপরদিকে কুরআনের কিছু ইঙ্গিত, অস্পষ্ট বর্ণনার সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্য ও আবিষ্কারের তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও সমন্বয় (যে সম্পর্কে সর্ববৃহৎ প্রচেষ্টা গত শতাব্দীর বিখ্যাত মনীষী আল্লামা তানতাভী জাওহারী মিসরী তদীয় সুবিখ্যাত তাফসীর জাওয়াহিরুল কুরআনে করেছেন) অত্যন্ত নাজুক এবং বিপজ্জনকও।

এর প্রধান কারণ হলো, প্রবল সম্ভাবনা আছে বরং বিজ্ঞান ও গবেষণার ইতিহাসে এ এক পরীক্ষিত সত্য বিজ্ঞান ও গবেষণার যে ফল আজ একেবারে দুইয়ে দুইয়ে চারের মতো সরল স্বাভাবিক ও চূড়ান্ত মনে হচ্ছে, সকলেই বাস্তব সত্য হিসেবে মেনে নিচ্ছে, কালই তা সম্পূর্ণ বদলে যেতে পারে। এর বাস্তবতা ও অকাট্যতা সন্দেহের চোরাবালুতে হারিয়ে যেতে পারে, বিক্ষত হয়ে পড়তে পারে এর ইতিহাস। তাছাড়া এ জাতীয় জ্ঞান সাধনা (যার নিয়তের সত্যতা, শুদ্ধতা ও কল্যাণ মানসিকতার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাসহই বলা যায়) কুরআনে কারীমের মূল লক্ষ্য এবং আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে দূরত্ব এবং আধুনিক জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার গন্ধ থেকে মুক্ত নয়। তাছাড়া প্রাচীন দর্শন ও বিখ্যাত ঐতিহাসিক বর্ণনার ক্ষেত্রেও অতীতকালের কোনো কোনো মুফাসসির এ স্খলনের শিকার হয়েছেন– কিন্তু যেহেতু এই জাতীয় বিষয় ও বক্তব্য কুরআন মাজীদের সুবিশাল তাফসীর গ্রন্থসমূহ খুব সামান্য অংশ জুড়েই অবস্থিত আর মুসলমানগণের স্বীকৃত গবেষণা অঙ্গনে তা বিশেষ কোন মর্যাদা ও গুরুত্বের অধিকারীও নয় তাই কোনকালেই কুরআন মাজীদকে এই জাতীয় ভ্রান্তি ও বিভ্রাটের মোকাবেলা করতে হয়নি। মুখোমুখি হতে হয়নি এ জাতীয় কঠিন কোন পরীক্ষার। অথচ আহদে কাদীম– বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট পদার্থ, সৌর ও ভৌগোলিক নানা আবিষ্কার ও ব্যাখ্যার সংমিশ্রণে পড়ে কঠিন পরীক্ষার শিকার হয়েছে। মধ্যযুগের খৃষ্টজগতে যার নামই পড়ে গিয়েছিলো CHRISTIAN TOPOGRAPHY.

কিন্তু জড়তা ও আধুনিক বিজ্ঞানের প্রভাবমুক্ত সুস্থ ও ইনসাফপ্রিয় কোনো অনুসন্ধানী পাঠক কুরআনে কারীম অধ্যয়নের সময় এ কথা জেনে বিস্মিত ও বিমূঢ় হবেন, যদিও এই মহান গ্রন্থ এখন থেকে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে আরবের এক

সীমাবদ্ধ বিচ্ছিন্ন পরিবেশে এক নিরক্ষর নবীর উপর অবতীর্ণ হয়েছে, তবু এই মহাগ্রন্থে বিপুলভাবে এমন অনেক তথ্য ও তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে, যেগুলোর সম্পর্ক ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থ-বিজ্ঞান সৌরজগত, প্রাণীবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, মানবদেহ, সৃষ্টি রহস্য, মানবসৃষ্টির বিভিন্ন স্তরসহ বিজ্ঞানের এমন অনেক বিষয় বিগত শতাব্দিগুলোতে যেসব ক্ষেত্রে আবিষ্কারের অনেক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। আর মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানেও আকাশ পাতাল পরিবর্তন এসেছে। এতে এমন কোন তথ্য পরিবেশিত হয়নি, যাকে আধুনিক বিজ্ঞান অস্বীকার করেছে কিংবা অবাস্তব বলেছে। বরং এতে এমন অনেক তথ্য ও ইঙ্গিত পরিবেশিত হয়েছে, যা কিনা আধুনিক বিজ্ঞান অতি সাম্প্রতিককালে উন্মোচন করেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা কুরআনের সেই সব তথ্য ও জ্ঞানের দিকে এখনো ধাবমান। স্পর্শ করতে আরো অনেক দেরী। এ জাতীয় বিষয়াবলীর বিশ্লেষণ করতে হলে একটি মাত্র গ্রন্থ নয়; বরং একটা বিরাট লাইব্রেরী প্রয়োজন। উপমাস্বরূপ আমরা এখানে একজন বরেণ্য ফ্রান্স গবেষকের একটি উদ্ধৃতি পেশ করছি। সম্প্রতি ফ্রান্সের এই বিখ্যাত গবেষক মরিস বুকাইলী-এর বিখ্যাত গ্রন্থ 'বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান' [THE BIBLE, THE QURAN AND SCIENCE] এর আরবী[১] অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে 'দিরাসাতুল কুতুবিল মুকাদ্দাসা ফী যাওইল মা আরিফিল হাদীসাহ' শিরোনামে।

গবেষক মরিস বুকাইলী তার এই গ্রন্থ লিখেন–

কুরআনের সাথে সংশ্লিষ্ট এসব বৈজ্ঞানিক বিষয়াবলী শুরুতেই আমাকে বিস্ময়াবিষ্ট করেছে। আমি ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি আজ থেকে তেরশ' বছর পূর্বে অবতীর্ণ একটি গ্রন্থে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে এতো বিপুলসংখ্যক দাবি ঘোষণা ও বর্ণনা থাকতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে অসংখ্য দিক ও বৈচিত্র্য। অতঃপর তা হবে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ফলাফলের সম্পূর্ণ অনুকূল।[২]

আলোচ্য লেখক এ সুবাদে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি, সৃষ্টি জগতের অস্তিত্ব, আকাশের গ্রহ নক্ষত্র, আকাশের মূল প্রকৃতি, সৌরজগতের উন্নতি, বায়ুমণ্ডল, মানবজীবনে পানি ও সমুদ্রের মৌলিক অবদান, পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ, পর্বতমালা, উদ্ভিদ, প্রাণীজগত, জীবনের সূচনা, মানববংশ সম্প্রসারণ ও প্রজনন প্রক্রিয়া, মায়ের গর্ভে সন্তানের বেড়ে উঠার প্রকৃতি, হযরত নূহ (আ.)-এর তুফান, মিশরে বনি ইসরাঈলের অবস্থানকালে মিশর থেকে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রস্থান,

---

[১]. বাংলা ভাষায় এর অনুবাদ করেছেন এ দেশের বিখ্যাত সাংবাদিক সাহিত্যিক আখতার উল আলম। প্রকাশ করেছে ঢাকার মদীনা পাবলিকেশন্স। অনুবাদক

[২]. দিরাসাতুল কুতুবিল মুকাদ্দাসা, দারুল মা আরিফিল হাদীছাহ, কাহেরা, ১৪৪পৃ.

হযরত মূসা (আ.)-এর কালের ফেরাউন প্রসঙ্গ ইত্যাকার ঐতিহাসিক বিষয়ে স্বতন্ত্র আলোকপাত করেছেন। অতঃপর তিনি পদার্থ, সৌর ও প্রাণীবিজ্ঞান এবং চিকিৎসা ও ইতিহাস বিজ্ঞানের আধুনিক গবেষণার আলোকে কুরআন ও বাইবেলের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তারপর এভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন–

তাওরাত ও ইঞ্জিলের এই সকল ভাষ্যাবলীর তুলনায় কুরআন মাজীদের ভাষ্যাবলী বিজ্ঞান ও আধুনিক গবেষণার ফলাফলের সঙ্গে বিস্ময়করভাবে অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যশীল।[৩]

লেখক তার এই মর্যাদাশীল গ্রন্থের সমাপ্তি টেনেছেন এভাবে–

কোনো মানুষের পক্ষে এটা চিন্তা করাও সম্ভব নয়, নিরেট তথ্য ও বিজ্ঞানভিত্তিক এতো বিপুল বর্ণনা দাবি ও প্রসঙ্গপূর্ণ এই গ্রন্থ কোনো মানুষের রচনা হতে পারে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় জ্ঞান-বিজ্ঞানের পর্যায় ও মাত্রাকে সামনে রাখলে ইনসাফ ও বিবেক খুব সহজেই এই ফলাফলে উত্তীর্ণ হতে বাধ্য, কুরআন অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে কৃত ওহীর উপরই নির্ভরশীল এবং এই বিচারে তাকে অবশ্যই ভিন্ন মর্যাদার আসনে রাখতে হয় যে, এর বিশুদ্ধতা কোনরূপ সংশয় ও সন্দেহের উর্ধ্বে। অধিকন্তু এই কারণেও একে ভিন্ন মর্যাদা দিতে হয়, এতে আলোচিত বৈজ্ঞানিক ফলাফল ও বিভিন্ন মাত্রার অসংখ্য আলোচ্য বিষয়কে বর্তমান কালের বিজ্ঞান ও গবেষণার সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা করার পর এর প্রতিটি বিষয়ই যথার্থ বলে উত্তীর্ণ ও প্রমাণিত হয়েছে।[৪]

অনুরূপভাবে মহান এই গ্রন্থে মানুষের সাময়িক, সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারারও কোনো প্রভাব নেই। বরং জীবিকা, সমাজ, রাষ্ট্র ও সময় সম্পর্কেও এর নির্দেশনা চূড়ান্ত, স্থায়ী ও উত্তীর্ণ।

[৩]. প্রাগুক্ত, ২৮৬ পৃ.
[৪]. প্রাগুক্ত

অদৃশ্য ঘটনাবলীর বিশ্বস্ত বর্ণনা কুরআনুল কারীমের তৃতীয় বিশিষ্ট মু'জেযা

কুরআন মাজীদে আলোচিত অতীতকালে নবী বা রাসূল বিভিন্ন জাতির ঘটনাবলীর বিবরণ কুরআনের একটি স্বতন্ত্র মু'জেযা। এই মু'জেযার ভিত্তি হলো, এসব ঘটনা হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পেরেছেন আল্লাহর ইলম অদৃশ্য জ্ঞানভাণ্ডার ওহীর মাধ্যমে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো ছিলেন নিরক্ষর। আর এসব ঘটনার অধিকাংশই বিধৃত হয়েছে মক্কী সূরাগুলোতে। তাছাড়া ঐতিহাসিক সর্বসম্মত মত হলো, সেকালে মক্কায় কোনো ইহুদী বা খৃষ্টান ছিলো না। ওয়ারাকা ইবনে নাওফেল, যিনি ইনজিলের জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে, তিনি নবুওয়তের প্রথম বছর প্রথম ওহী অবতীর্ণ হবার পরই মারা যান।

হিজরতের পূর্বে দু'জন ইহুদীর সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ হয়েছে বলে বর্ণিত আছে। একজন পাদ্রী 'বুহাইরা' অন্যজন 'উদাস'। প্রথম জনের সাথে সিরিয়ার বুসরা শহরে আর দ্বিতীয় জনের সাথে হেজাযের তায়েফ শহরে সাক্ষাৎ হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম জনের সাথে কয়েক ঘণ্টার সাক্ষাৎ আর দ্বিতীয় জনের সাথে কয়েক মিনিটের। প্রথম সাক্ষাতের সময় বয়স ছিলো তের বছর। তাই এতো ছোট বয়সে, এতো স্বল্প সময়ে বিদেশি অপরিচিত ভাষার এক ব্যক্তির সাক্ষাতে এতো বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার সংগ্রহ করে নিয়েছেন যা তিনি পরবর্তীকালে নবুওয়তের দীর্ঘ তেইশ বছর ধীরে ধীরে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন– এমন কথা কোনো সুস্থ মানুষ বলার সাহস করবে না। আর এতোটা বিস্তারিত ও বিশুদ্ধ বর্ণনা, যা কিনা স্বয়ং ইহুদী খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থেও নেই।

'উদাস' নিজে কোনো আলেম ছিলেন না। তিনি বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তাই এতোটা দুর্বল যুক্তি ও বর্ণনার ভিত্তিতে দাবির এই কঠিন অট্টালিকা নির্মাণ করা যাবে না, অদৃশ্যের যেসব সংবাদ তিনি দিয়েছেন, তার প্রতিটি বর্ণ-বিন্দু পর্যন্ত হাজার বছরের চিন্তা গবেষণা ও আবিষ্কারের বিচারে শুদ্ধ ও যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে, তা তিনি অর্জন করেছেন এমন ব্যক্তির কাছ থেকে, যিনি নিজেই দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের আস্তরণে আচ্ছাদিত। তাছাড়া মূলের চাইতে বর্ধিত অংশ কি এতো বেশি হতে পারে? আর যে প্রদীপ নিজেই আলোকহীন, তা থেকে অন্য প্রদীপ আলো পায় কি করে? এই অসহায় খৃষ্টান সম্প্রদায় প্রিয়তম নবীকে– যাদের ছাত্র বানাবার

এতো কোশে– খোদ তাদের কাছে কি এমন কোনো তথ্য ছিলো, যাকে শুদ্ধ ও খাঁটি বলা যায়?

এতে এ কথাই প্রমাণিত হয়, এসব ঘটনা জানার কোনো মাধ্যম অন্তত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিলো না। বরং এসব ঘটনা ওহীরই কারিশমা। আর এ বিবেচনায়ই এসব ঘটনা অলৌকিকতার অন্তর্ভুক্ত। কুরআন মাজীদ বারবার মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এসব ঘটনার প্রতি। হযরত মারয়াম ও হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর জন্মের ঘটনা এবং হযরত মারয়াম (আ.)-এর জীবনের কিছু ছোট ছোট ঘটনা বর্ণনার পর ইরশাদ হয়েছে–

ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ
أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ০

এটা অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ, যা আমি তোমাকে ওহী দ্বারা অবহিত করছি। মারয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাদের মধ্যে কে গ্রহণ করবে, এর জন্যে যখন তারা তাদের কলম নিক্ষেপ করছিলো, তুমি তখন তাদের কাছে ছিলে না এবং তারা যখন বাদানুবাদ করছিলো, তখনও তুমি তাদের কাছে ছিলে না। *[আলে ইমরান : ৩ : ৪৪]*

হযরত নূহ (আ.)-এর তুফানের ঘটনা বর্ণনার পর ইরশাদ করেন–

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ
مِنْ قَبْلِ هَٰذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ০

এ সমস্ত অদৃশ্যলোকের সংবাদ আমি তোমাকে ওহীর মাধ্যমে অবহিত করছি, যা এর আগে তুমি জানতে না এবং তোমার সম্প্রদায় জানতো না। সুতরাং ধৈর্যধারণ করো। শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্যেই। *[হুদ : ১১ : ৪৯]*

হযরত ইউসুফ (আ.) এর ঘটনা বর্ণনার পর বলেন–

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ
وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ০

আমি তোমার কাছে উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি ওহীর মাধ্যমে তোমার কাছে এই কুরআন প্রেরণ করে; যদিও ইতোপূর্বে তুমি ছিলে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত। *[ইউসুফ : ১২ : ৩]*

অতঃপর উল্লিখিত কাহিনীসমূহ বর্ণনার পর ইরশাদ করেন–

ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا
أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ০

এটা অদৃশ্যলোকের সংবাদ, যা তোমাকে আমি ওহীর মাধ্যমে অবহিত করছি; ষড়যন্ত্রকালে যখন তারা মতৈক্যে পৌছেছিলো তুমি তখন তাদের সঙ্গে ছিলে না। *[ইউসুফ : ১২ : ১০২]*

একই সূরায় এ কথাও বলা হয়েছে, এসব কাহিনী বানোয়াট নয়; বরং এর দ্বারা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের সমর্থন ও সত্যায়ন হয়।

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ
وَلَٰكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً
لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ০

তাদের বৃত্তান্তে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্যে রয়েছে শিক্ষা। এ বাণী মিথ্যা রচনা নয়। কিন্তু মুমিনদের জন্যে এটা পূর্ব গ্রন্থে যা আছে তার সমর্থন এবং সকল কিছুর বিশদ বিবরণ, হেদায়াত ও রহমত। *[ইউসুফ : ১২ : ১১১]*

কাফের গোষ্ঠী এও বলেছিলো, মুহাম্মদ কিছু লোকের সাহায্যে ও চক্রান্তে এসব বলে বেড়ান। এর জবাবে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ
آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ০

কাফেররা বলে, এটা মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়। সে এটা উদ্ভাবন করেছে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে এ বিষয়ে সাহায্য করেছে। এভাবে তারা অবশ্যই জুলুম ও মিথ্যায় উপনীত হয়েছে। *[ফুরকান : ২৫ : ৪]*

সূরা কাসাসে স্পষ্ট ইরশাদ হয়েছে, এসব ঘটনা সংঘটনের সময় হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত ছিলেন না। তিনি এসব ঘটনা জানতেনও না। আর এ জানা ও বর্ণনার মূল উৎস একমাত্র ওহী।

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ○ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ○ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ○

যখন মূসাকে আমি বিধান দিয়েছিলাম, তখন তুমি পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলে না এবং তুমি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলে না। বস্তুত আমি অনেক মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটিয়েছিলাম; অতঃপর তাদের উপর বহু যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে। তুমি তো মাদায়েনবাসীর সঙ্গে ছিলে না তাদের কাছে আমার আয়াত তেলাওয়াত করার জন্য। আমিই তো ছিলাম রাসূল প্রেরণকারী। মূসাকে যখন আমি আহ্বান করেছিলাম, তখন তুমি তূর পর্বত পার্শ্বে উপস্থিত ছিলে না। মূলত এটা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ– যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারো, যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোনো সতর্ককারী আসেনি– যেনো তারা উপদেশ গ্রহণ করে। *[কাসাস : ২৮ : ৪৪-৪৬]*

সূরা আনকাবূত-এ অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, এসব ইতিবৃত্ত উৎস ও উপাদান সম্পর্কে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ বেখবর। তিনি ছিলেন 'উম্মী' নিরক্ষর। সমকালীন জ্ঞান, শিক্ষা, শিক্ষার পদ্ধতি পরিবেশ কোনো কিছুর সাথেই তিনি পরিচিত ছিলেন না। তারপরও কি তিনি যে এসব জ্ঞান-মহাজ্ঞানের মহাউৎস মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে লাভ করেছিলেন, তাতে কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকতে পারে?

وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ○

তুমি তো ইতোপূর্বে কোনো কিতাব পাঠ করোনি এবং স্বহস্তে কোনো কিতাব লেখনি যে, মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষণ করবে। *[আনকাবূত : ২৯ : ৪৮]*

কুরআন মাজীদ ও অন্যান্য আসমানী গ্রন্থের মধ্যে পার্থক্য

নবুওয়তকালে কিংবা তারপর যারা ধারণা করেছিলো, কুরআনে কারীমের তথ্য ও বর্ণিত ঘটনাবলী তাওরাত ইনজিল থেকে সংগৃহীত, তারা যে তাওরাত ইনজিল সম্পর্কেও অজ্ঞ, এতে তাও ফুটে উঠেছে। কারণ, এখনো পৃথিবীতে তাওরাত ইনজিল আছে। আছে কুরআন মাজীদও। ইহুদী খৃষ্টানরা এও বিশ্বাস করে, তাদের এই 'পবিত্র গ্রন্থ' সংরক্ষিত। তাই কেউ চাইলে খুব সহজেই কুরআনের সাথে তাওরাত ইনজিলকে মিলিয়ে দেখতে পারে। এর দাবিকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা যায়। আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-এর ঘটনাবলী ইনজিলে আছে, কুরআনেও আছে। কোনো পাঠক এসব ঘটনা উভয় গ্রন্থে পাঠ করে বলতে পারবে না, এখানে একটি অপরটির উৎস হতে পারে বা একটি থেকে অপরটিতে এই ঘটনাটি নেয়া হয়েছে। হ্যাঁ, ঘটনার কোনো কোনো অংশ উভয় গ্রন্থে এমনভাবে পরিবেশিত হয়েছে, যাতে স্পষ্ট বুঝা যায়, এসব গ্রন্থের মূল উৎস একটাই। আর সেটা হলো ওহী। তবে এটাও বুঝতে সমস্যা হয় না, এর মধ্যে একটি অক্ষত অবস্থায় সংরক্ষিত আছে, আর অপরটি মানুষের হাতে পড়ে তার প্রকৃত রূপ ও আদল হারিয়ে ফেলেছে। তাই একটি রক্ষিত অপরটি বিকৃত। এসব গ্রন্থের বর্ণনা পদ্ধতি, বিষয়ের তাৎপর্য ও মূল প্রেরণায় পার্থক্য স্পষ্ট। উভয়টির ধারা ও পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা। একটিতে ওহীর প্রভাব, ইলাহী গ্রন্থের স্থায়িত্ব ও ওহীর নূর স্পষ্ট নজরে পড়ে। পাঠ করলে মনে হয়, এটা কোনো ইতিহাসের বিষয় নয়; বরং হেদায়াত, শিক্ষা ও উপদেশের পরশমণি। এসব ঘটনায় সনের উল্লেখ নেই, সংখ্যার বর্ণনা নেই, সদস্যদের পরিমাণের কথাও নেই। ইতিহাস ও গোষ্ঠীকেন্দ্রিক বিস্তারিত তথ্যাবলী খুবই যত্নের সঙ্গে উহ্য রয়েছে। ঘটনায় কেবল এসব দিকই স্থান পেয়েছে, যা সকল কালের ও সকল মানুষের জন্য হেদায়াত, নূর ও শিক্ষার আলো বয়ে আনতে পারে।

সূরা ইউসুফের শেষে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○

তাদের বৃত্তান্তে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে শিক্ষা। এ বাণী মিথ্যা রচনা নয়। কিন্তু মুমিনদের জন্য এটা পূর্ব গ্রন্থে যা আছে, তার সমর্থন এবং সকল কিছুর বিশদ বিবরণ, হেদায়াত ও রহমত। *[ইউসুফ : ১২ : ১১১]*

আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) ও প্রাচীনকালের বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর ঘটনাবলীতে সতত এই প্রাণই অনুরণিত হয়। আর কালামে ইলাহীর শান মানও তো এটাই। এটাই আল্লাহর বাণীর বৈশিষ্ট্য। এটাই অলৌকিকতার দলিল। স্বয়ং পয়গাম্বরের মধ্যেও প্রবল শক্তিতে বিচরণ করে এই গুণ। নবীগণ অপ্রাসঙ্গিক বিস্তীর্ণ ইতিহাসের ধুলো-বালি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে চলেন। যত্নের সাথে আলোচনা করেন সেইসব বিষয়, যাতে মানুষের পথ চলার আলো রয়েছে, পাথেয় রয়েছে। ফেরাউন হযরত মূসাকে (আ.) ঐতিহাসিক ঘটনার আবর্তে আক্রান্ত করতে চেয়েছিলো। হযরত মূসা (আ.) কৌশলে এড়িয়ে গেছেন বিভ্রান্তিকর সেই প্রসঙ্গ। ফেরাউন বলেছিলো–

فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْأُوْلٰى ۝

তাহলে আগেকার যুগের লেকদের কী অবস্থা হবে? *[ত্বাহা : ২০ : ৫১]*

মূসা (আ.) জবাব দিলেন–

عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِيْ كِتٰبٍ لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسَى ۝

এটা আমার প্রভুই জানেন, যা কিতাবে (লেখা) আছে। আর আমার প্রভুর ভুল-চুক হয় না। *[ত্বাহা ২০ : ৫২]*

এর বিপরীতে তাওরাতের রাজা বাদশাহ, ইতিহাস ও কিতাবে আদি পুস্তক খুলে পড়ুন, যেনো এক ইতিহাসের বই। সাল ব্যক্তিবিশেষ, বংশ ও কবীলার সংখ্যা ও বিভিন্ন অট্টালিকার বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। তাতেও কোথাও কোথাও ওহীর কিরণ নজরে পড়ে। মানুষের মন বলে উঠে– এটা খোদার কালামের তরজমা হবে হয়তো।

হযরত ইউসুফ (আ.) : বাইবেল ও কুরআনে

আমরা তাওরাত ও কুরআনের পার্থক্যকে তুলে ধরার জন্য উপমাস্বরূপ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনাটি নির্বাচিত করেছি। কারণ এই ঘটনাটি কুরআন ও বাইবেল উভয় গ্রন্থেই অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

তাওরাতের বর্ণনায় বেশ কিছু অতিরিক্ত অংশ রয়েছে, যেগুলো কুরআনে নেই। অবশ্য এগুলো সাধারণত বিভিন্ন নামের সনাক্তকরণ ও ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাভিত্তিক। বাইবেলে এহুদার একটি ঘটনা আলোচিত হয়েছে। ঘটনাটি পড়লে সভ্যতার মাথা এমনিতেই নুয়ে পড়ে। এই ঘটনা কোনোভাবেই হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর পরিবারের সাথে যুক্ত হতে পারে না। এতে এমন কিছু কথাও আছে, যা সরাসরি হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নবুওয়ত পরিপন্থী। *[অধ্যায় : ৪২]*

পক্ষান্তরে কুরআনে কারীমে এসব ঘটনার এমন কিছু টুকরো অংশ আছে, যা তাওরাতে নেই। যেমন:

১. স্বপ্নের ব্যাখ্যা বর্ণনার ক্ষেত্রে হযরত ইউসুফ (আ.) আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে হৃদয়গলানো একটি চমৎকার আলোচনা করেছিলেন। এতে দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে নবীসুলভ কৌশল পদ্ধতির বিরল সুন্দর চিত্র ফুটে ওঠেছে। এতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সৌন্দর্য পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হয়েছে। অথচ তাওরাতে এই বিষয়টি একেবারেই স্থান পায়নি। *[সূরা ইউসুফ : ৩৬-৪১]*

কুরআন বলছে, মিসরঅধিপতি যখন স্বপ্ন দেখলেন এবং হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ব্যাখ্যা শুনলেন, তখন তিনি হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠলেন। তিনি হযরত ইউসুফ (আ.)কে নিয়ে আসার জন্য দূত পাঠালেন। কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ.) কারাগার থেকে বের হওয়ার জন্য মোটেও অস্থির হলেন না। বরং তিনি প্রয়োজন মনে করলেন, জেল থেকে বের হওয়ার পূর্বে যে ঘটনার অসত্য অভিযোগে তাঁকে কারাগারে বন্দী করা হয়েছে এবং তা বেশ প্রচারও পেয়েছে; ঠিক একইভাবে সেই ঘটনার অসত্যতা ও তাঁর চারিত্রিক পবিত্রতার বিষয়টিও যাতে সমান প্রসিদ্ধি লাভ করে। যাতে মানুষ তার এই মুক্তিকে বাদশাহর অনুগ্রহ মনে না করে; বরং তাঁর নির্দোষ ও নিষ্কলষতার ফলাফল মনে করে। মূলত এই ঘটনা নবুওয়তের মর্যাদা, তাঁর বংশগত সম্মান, আত্ম মর্যাদাবোধ, মেধা ও দূরদর্শিতারও একটি উজ্জ্বল প্রমাণ ছিলো। সঙ্গত, প্রয়োজনীয় ও ঈমানদীপ্ত এই আলোচনাটি তাওরাতের কোথাও নেই।

তবে তাওরাতে আছে–

'ইউসুফ (আ.)-এর এই ব্যাখ্যা ফেরাউন ও তার অনুগত কর্মচারীদের দৃষ্টিতে খুবই পছন্দ হলো। ফেরাউন তার কর্মচারীদের বললো, আমি কি এর মতো ব্যক্তি, যার মধ্যে খোদার রূহ আছে? আমি কি তার মতো হতে পারি? ফেরাউন 'ইউসুফ (আ.)কে বললো, তোমাকে খোদা যে দূরদৃষ্টি দান করেছেন, তাতে তোমার মতো বুদ্ধিমান, ধীমান ও দূরদর্শী আর কেউ নেই। তাই তুমি আমার ঘরের অধিপতি হয়ে যাও, আমার প্রজাদেরকে তুমি শাসন করো। তবে সিংহাসনের বেলায় আমি তোমার চাইতে অধিক মর্যাদার অধিকারী। *[আদি পুস্তকে : আয়াত : ৩৭ : ৪০]*

২. আল-কুরআন বলেছে–

فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي
قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ o

দূত যখন তার সামনে উপস্থিত হলো, তখন সে বললো, তুমি তোমার প্রভুর কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস করো, যে নারীরা হাত কেটে ফেলেছিলো, তাদের অবস্থা এখন কি? নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক তাদের ছলনা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। *[ইউসুফ : ১২ : ৫০]*

অতঃপর যখন বাদী নিজে– যার অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো– নিজের ভাষায় তাঁর পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা বর্ণনা করলো। তার মুখেই ইউসুফ (আ.)-এর চারিত্রিক স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা উচ্চারিত হলো, তখন তিনি কেনো তদন্ত দাবি করলেন? সেই তদন্ত দাবির কারণ কুরআন প্রকাশ করেছে এভাবে–

ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ
الْخَائِنِينَ o

এটা এই জন্যে, যাতে সে (মিসর অধিপতি) জানতে পারে তার অনুপস্থিতিতে আমি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না। *[ইউসুফ : ১২ : ৫২]*

অতঃপর 'আমিত্ব' কেন্দ্রিক কোনো সন্দেহ যাতে তাঁর প্রতি সৃষ্টি না হয়, সে জন্য পরিষ্কার ভাষায় নবীসুলভ বিনয়ের সাথে এও বলে দিয়েছেন–

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي
غَفُورٌ رَحِيمٌ o

আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না। মানুষের মন অবশ্যই মন্দকর্মপ্রবণ। কিন্তু সে নয়, যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন। আমার প্রতিপালক তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *[ইউসুফ : ১২ : ৫৩]*

এসব কথা দ্বারা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়, এগুলো নবীর কণ্ঠের কথা। এতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জীবন চরিত্রও ভাস্বর হয়ে ওঠেছে। অথচ তাওরাতে গুরুত্বপূর্ণ এই অংশগুলো নেই।

৩. তাওরাতে হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর কথাবার্তা বিবৃত হয়েছে। কিন্তু তাতে নবুওয়াত ও লিল্লাহিয়্যাতের নূর নেই। সে নূর আছে কুরআনের বর্ণনায়। আপনি নিজে তাওরাতের কিতাবে আদি পুস্তক আর কুরআন মাজীদ খুলে পড়ুন। তুলনা করুন। দেখবেন, কুরআনের আলোচনা দ্বারা বুঝা যায়, হযরত ইয়াকুব (আ.) ছিলেন একজন 'খোদাভরসা' ধরনের পূর্ণাঙ্গ আল্লাহভীরু ব্যক্তিত্ব। সকল ক্ষেত্রেই তিনি মহান আল্লাহর কুদরতী হাতের ইশারা লক্ষ করেন। কথায় কথায় তিনি আল্লাহর নাম নেন। তার বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেন। আর তাওরাতের পৃষ্ঠায় তিনি অংকিত হয়েছেন একজন হৃদয়বান, সন্তান-সন্ততির অধিকারী বয়োবৃদ্ধ অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব হিসেবে। 'বিনয়ামীন' থেকে যাবার পর ভাইদের হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর কাছে প্রত্যাবর্তন, হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর দরদপূর্ণ বিষাদঘন কথোপকথন– যাতে আল্লাহর প্রতি ভরসার নূর শব্দকে ভেদ করে হৃদয়ে আলো ফেলে। তাওরাতে তার কোনোই উল্লেখ নেই।[1]

৪. কুরআনে কারীমে আছে, হযরত ইউসুফ (আ.) যখন তার বিয়োগক্লান্ত পিতা আর বিক্ষিপ্ত ভ্রাতাদের সঙ্গে মিশরে মিলিত হন, তখন তার হৃদয় ছিলো আল্লাহর প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা আর এলাহী রহমতে প্লাবিত। রাজত্ব ও প্রশাসনের নোমায়েশী নকশায় ঝলসে ওঠে তাঁর খান্দানী দীনদারি, নবুওয়তের রৌশনী আর গোলামির বিনীত রূপ। রাজকীয় সম্মান ও শাসকীয় দাপট বিনীত বান্দার নমিত

---

[1]. দেখুন : পয়দায়েশ : ৪৪, ৪৫ পৃ

রূপকে পরাজিত করতে পারেনি। তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছেন এভাবে–

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ○

হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে রাজ্য দান করেছো এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছো। হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা! ইহলোক ও পরলোকে তুমিই আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দাও এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করো। *[ইউসুফ : ১০ : ১০১]*

ঈমানদীপ্ত এই কথোপকথনও তাওরাতে নেই।[২]

২. দেখুন : পয়দায়েশ : ৪৬-৪৭ অধ্যায়

কুরআন ও তাওরাতের বর্ণনায় আম্বিয়ায়ে কেরামের সীরাত

কুরআন মাজীদ এবং তাওরাতের মধ্যে অনেক বড় একটা পার্থক্য হলো, কুরআনে কারীম তাদের জীবনীকে কলংকহীন বিধৌত ও পবিত্র রূপে উপস্থাপন করেছে, যা নবী-রাসূলগণের জন্যে যথার্থ ও উপযুক্ত। আর নির্বোধ বন্ধু ও শত্রুদের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি আরোপিত সকল ভিত্তিহীন অভিযোগ ও অন্যায় অপবাদকে দৃপ্ত ভাষায় প্রতিহত করেছে। কিন্তু ওল্ড টেস্টামেন্টের বিভিন্ন অধ্যায়ে আম্বিয়ায়ে কেরামের জীবনচরিত সম্পর্কে এমন অনেক কথা বর্ণনা করা হয়েছে– যা পড়তে গেলে সভ্যতার মাথা এমনিতেই নত হয়ে পড়ে। ঘর্মাক্ত হয়ে পড়ে লজ্জার কপাল। কোথাও তাদের প্রতি কুফরীর অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। কোথাও বা খোলামেলা পাপী বলা হয়েছে।

আদি পুস্তকের নবম অধ্যায়ে হযরত নূহ (আ.) সম্পর্কে, ১৯তম অধ্যায়ে লূত (আ.) সম্পর্কে, খাজা পুস্তকের ৩২ নং অধ্যায়ে হযরত হারুন (আ.) সম্পর্কে, কিতাবে বাদশাহনামায় হযরত সুলাইমান (আ.) সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় কুফরি শিরক ও নানাজাতের পাপাচারের অসংখ্য সাক্ষ্য ও ঘটনা বিধৃত হয়েছে।

আর কুরআন মাজীদ হযরত নূহকে (আ.) 'রাসূলুন আমীন' (বিশ্বস্ত পয়গম্বর) বলেছে (সূরা শুআরা)। তাঁর প্রতি শান্তি ও বরকত বর্ষিত হয়েছে। *[হূদ : রুকু : ৪]*

৪. হযরত লূত (আ.) সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে–

وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ ○

এবং লূতকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান এবং তাকে উদ্ধার করেছিলাম এমন এক জনপদ থেকে, যার অধিবাসীরা লিপ্ত ছিলো অশ্লীল কর্মে; তারা ছিলো এক মন্দ সম্প্রদায়, সত্যত্যাগী। *[আম্বিয়া : ২১ : ৭৪]*

তাওরাত গ্রন্থ তো হযরত হারুনকে (আ.) সরাসরি বাছুরপূজারী বলে দিয়েছে। অপবাদের শব্দগুলো এমন–

হযরত মূসা (আ.)-এর অনুপস্থিতিতে বনি ইসরাঈলের কথায় হারুন (আ.) অলংকারের মূর্তি তৈরি করেন। বনি ইসরাঈলের সকলকে দিয়ে তার পূজা করান। তার নামে কুরবানী করার নির্দেশ দেন এবং বলেন, এই তোমাদের মাবুদ, যে তোমাদেরকে মিশর থেকে বের করে এনেছে।[১]

অথচ কুরআন মাজীদ এর সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র তুলে ধরেছে। তুলে ধরেছে হযরত হারুন (আ.)কে একত্ববাদের প্রচারক হিসেবে। ইরশাদ হচ্ছে–

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ○

হারুন পূর্বেই তাদেরকে বলেছিলো, হে আমার সম্প্রদায়! এর দ্বারা তো তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। তোমাদের প্রতিপালক তো দয়াময়। সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ করো এবং আমার আদেশ মেনে চলো। *[ত্বা-হা : ২০ : ৯০]*

হযরত সুলাইমান (আ.) সম্পর্কে তাওরাতের ভাষ্য হলো–

কারণ, সুলাইমান (আ.) যখন বৃদ্ধ হয়ে গেলেন, তখন তার বিবিগণ তার অন্তরকে অন্য উপাস্যদের দিকে আকৃষ্ট করে ফেললো। তখন তার অন্তর আল্লাহর সাথে পূর্ণ মাত্রায় সম্পৃক্ত রইলো না, যেমনটি সম্পৃক্ত ছিল তার পিতা দাউদ (আ.)-এর অন্তর। কেননা, সুলাইমান (আ.) সাইদানীদের দেবী উসতারাত আমূনীদের নাফরাতী মালাকমের পূজা করতে শুরু করলেন। সুলাইমান (আ.) আল্লাহর সামনে পাপ করেছেন এবং পিতা দাউদের (আ.) মতো পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর দাসত্ব করেননি।[২]

আরেকটু অগ্রসর হয়ে বলেছে–

খোদাওন্দ সুলাইমানের প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন। কারণ, তার অন্তর ইসরাঈলের খোদা থেকে ঘুরে গিয়েছিলো। যিনি তাকে দ্বিতীয়বার এই মর্মে আদেশ করেছিলেন অন্য মাবুদের আনুগত্য করবে না। কিন্তু তিনি খোদার এই হুকুম মান্য করেননি।[৩]

আর দেখুন সূরা সফ-এ আল্লাহ তায়ালা তাঁর এখলাস ও পরিপূর্ণ আবদিয়্যাত সম্পর্কে ইরশাদ করেন–

---

[১]. কিতাবে খুরুজ : অধ্যায়- ৩২

[২]. কিতাবে মুকাদ্দাস, বাদশাহনামা অধ্যায়:১১, আয়াত: ৫, ৬, ৭

[৩]. প্রাগুক্ত : আয়াত- ১০-১১

وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ○

আমি দাউদকে দান করলাম সুলাইমান। সে ছিলো উত্তম বান্দা এবং সে ছিলো অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী। *[সফ : ৬১ : ৩০]*

আরেকটু অগ্রসর হয়ে ইরশাদ করেছেন–

وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ ○

এবং তার জন্য আমার কাছে রয়েছে নৈকট্যের মর্যাদা ও শুভ পরিণাম। *[সফ : ৬১ : ৪০]*

একইভাবে হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁর জননীর প্রতি যতো অভিযোগ আরোপ করেছে ইহুদী জাতি, যতো দোষ ও কলংক লেপন করেছে তার উপর; তার স্পষ্ট প্রতিবাদ করেছে পবিত্র কুরআন। কুরআন মাজীদ হযরত ঈসাকে (আ.) একজন মর্যাদাবান বরকতপূর্ণ আল্লাহর নৈকট্যলাভে ধন্য সম্মানিত নবী হিসেবে চিত্রিত করেছে। *[দেখুন সূরা আলে ইমরান, মারয়াম, যুখরুফ]*

অন্যান্য আসমানী গ্রন্থের অনুসারীগণ তাদের কিতাবকে অক্ষত মনে করে। আমরা তাদের ও আমাদের ধর্মগ্রন্থের যৌথভাবে পরিবেশিত কিছু তথ্য উপস্থাপন করলাম। উভয় প্রকার গ্রন্থের মধ্যকার মৌলিক পার্থক্যও উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেছে এই বর্ণনায়। এর বাইরেও কুরআনে এমন অনেক তথ্য আছে, যেগুলো ওসব ধর্মগ্রন্থে নেই। তারপরও এ কথা বলা, কুরআন অতীতকালের ধর্মগ্রন্থগুলো থেকে গৃহীত– এটা কুরআন এবং নিজেদের ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে অজ্ঞতারই দলিল মাত্র।

কুরআনে কারীমের সকল তথ্য সরাসরি আল্লাহ তায়ালার ইলম থেকে প্রাপ্ত। আসমানী মহাউৎস থেকে উৎসারিত এই জ্ঞানভাণ্ডার সকল প্রকার সংশয় ত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে পাক এবং সম্পূর্ণ বাস্তবসিদ্ধ। অতীতকালের আসমানী কিতাবগুলো যেমন মানুষের হাত থেকে রক্ষা পায়নি, ইহুদীদের সম্মানিত নবীগণের সম্মানিত গ্রন্থাবলীকে যেমন তারা রদবদল করে ছেড়েছে; কুরআনের ক্ষেত্রে তেমনটি ঘটেনি। বরং কুরআনে কারীম এসব গ্রন্থের সত্যায়নকারী ও অভিভাবক।

প্রাচীনকালের ধর্মগ্রন্থগুলোর বিকৃতি সম্পর্কে সতর্কবাণী এবং অতীতকালের ধর্মগুলোর আকীদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য

কুরআনে কারীমের অলৌকিকতার আরেকটি দিক হলো, ইহুদী খৃষ্টানদের বিভিন্ন মাযহাব, ফেরকা ও দলের বিরোধপূর্ণ আকীদা ও চিন্তাগুলোকে অত্যন্ত সঠিক ও যথার্থভাবে তুলে ধরেছে কুরআন যা ইতিপূর্বে সাধারণ মানুষের জানার বাইরে ছিলো। আর এই বিরোধপূর্ণ চিন্তা ও মতগুলো বর্ণনার ক্ষেত্রেও অসাধারণ যত্ন ও তীক্ষ্ণতার পরিচয় দিয়েছে পবিত্র কুরআন। অতীব ছোট ও ক্ষুদ্র ধরনের বিষয়কে কুরআন এতোটা সতর্কতার সাথে আলোকপাত করেছে, যা তাদের ধর্মীয় জ্ঞানভাণ্ডার গভীর দৃষ্টিতে মন্থন করলে কুরআনের প্রতিটি শব্দের সমর্থন পাওয়া যায়। আর যতোই তাদের ধর্মগ্রন্থসমূহের (যা আজকাল ব্যাপকভাবে ছাপা ও প্রচারিত হচ্ছে।) পাঠ বাড়ছে, ততোই তাদের ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে কুরআনের অভিমত ও বিশ্লেষণের সত্যতা ও প্রামাণ্যতা বিকশিত হচ্ছে। বিরল বিস্ময়কর অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হচ্ছে। এতে সুস্পষ্টভাবে এটাই প্রমাণিত হয়, এদের সম্পর্কে কুরআন অনর্থক ও অহেতুক কোনো কথা বলেননি। কুরআনের বলা শব্দগুলোও অসঙ্গত নয় কোনো ক্ষেত্রেই।

আর ব্যক্তি ও ঘটনার ক্ষেত্রেও কুরআন কোনো বিষেয়ের প্রতি জোর দিয়েছে কিংবা কোনো বিষয়কে অস্বীকার করেছে- এরও মূল কারণ হলো ইহুদী খৃষ্টানদের মানা না মানা। তাদের ভিত্তিহীন অনেক অভিযোগকে খণ্ডন ও প্রতিবাদ করার জন্যই কুরআন এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। এ সম্পর্কে আমরা এখানে তিনটি উপমা তুলে ধরছি।

১. কুরআনে কারীম হযরত সুলাইমান (আ.)-এর প্রতি আরোপিত কুফরীকে কঠোরভাবে অস্বীকার করেছে। ইরশাদ হয়েছে–

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا ۝

সুলাইমান আদৌ কোনো কুফরী কথা বলেনি; বরং শয়তানরাই কুফুরী করে বেড়িয়েছে। *[বাকারা : ২ : ১২]*

যে কোনো সুস্থ ও নিরপেক্ষ মনের অধিকারী ব্যক্তি বিস্মিত হতে পারে, একজন সম্মানিত ও বিখ্যাত নবী সম্পর্কে 'সে কুফুরী করেনি' একথা বলার কী অর্থ হতে পারে? নবুওয়াতের আসনের জন্য ইমান শুধু অনিবার্যই নয়; বরং তিনি তো

হবেন সকল ঈমানদারের ইমাম অনুসরণীয় অগ্রপথিক নেতা ও অন্য সকলের ঈমান ও বিশ্বাসের সেতুবন্ধন, হেদায়েতের উৎস, আলোর পথের দীপ্ত নমুনা।

কিন্তু বাইবেলে হযরত সুলাইমান (আ.) সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করা হয়েছে, যার কিছু নমুনা ইতপূর্বে আমরা উল্লেখও করেছি। আর তাদের সম্পর্কে ইহুদীদের মধ্যে (নাউযুবিল্লাহ!) শিরক, মূর্তিপূজা ও জাদুশিক্ষাসহ যেসব ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে, অধিকন্তু ইহুদী লিটারেচার JEWISH ENCYVCLOPAEDIA এবং ENCYCLOPAEDIA OF RELEGION & ETHICS ইত্যাদি কোষগ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর নবী-রাসূলগণ সম্পর্কে ইহুদী দৃষ্টিভঙ্গি ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট যেভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তার আলোকে এসব তথ্য ও বর্ণনার প্রতিবাদ, হযরত সুলাইমান (আ.)-এর নিষ্পাপতা, পবিত্রতা ও মর্যাদা বিষয়ে উচ্চারিত কুরআনে কারীমের বক্তব্যগুলোর গুরুত্ব ও তাৎপর্য সকলের কাছেই প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। খৃষ্টজগত (যাদের আকীদা ও বিশ্বাসের উৎস কুরআন নয় বাইবেল), তারা আজও তাদের এই প্রাচীন বিশ্বাসের উপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

কিন্তু সবশেষে তাদেরকেও সেই সত্য দীপের কাছেই ফিরে আসতে হয়েছে। পৃথিবীর সকল সভ্যতার প্রচলিত সকল কেন্দ্রসমূহ থেকে সম্পূর্ণ দূরে আরব্য মরু প্রান্তরে বসে এক উম্মী নবী যে প্রদীপ প্রজ্বলিত করেছিলেন এখন থেকে সাড়ে তেরশ' বছর পূর্বে।

বৃটেনের পণ্ডিত ও সাধকদের গবেষণা ও দীর্ঘ অধ্যবসায়ের অসামান্য ফসল এনসাইক্লোপেডিয়া বৃটানিকায় হযরত সুলাইমান (আ.) সম্পর্কে বাইবেলের বিপরীতে এই মন্তব্য করেছে–

'সুলাইমান ছিলো এক অদ্বিতীয় খোদারই পূজারী।'[১]

বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট গবেষক বিশেষজ্ঞ ও একমাত্র খৃষ্টান পণ্ডিতদের জ্ঞান গবেষণার ফসল Encyclopadia Biblicaতে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে– (নাউযুবিল্লাহ) হযরত সুলাইমান (আ.) সম্পর্কে শিরক ও কুফুরী জাতীয় যেসব আয়াত বাইবেলে আছে সেগুলো বাইবেলের পরিবর্ধিত ও অন্যদের পক্ষ থেকে সংযোজিত অংশ। মূল বাইবেলে এগুলো ছিলো না।

---

১. ২য় খণ্ড, ১৫২ পৃ. চতুর্দশ সংস্করণ

অধিকন্তু স্ত্রীদের প্রভাবে যে তিনি দেবতাদের পূজা করেছেন বলে বর্ননা আছে, তারও শক্ত ভাষায় খণ্ডন ও প্রতিবাদ করা হয়েছে।[২]

২. কুরআনে কারীমে আছে, আল্লাহ তায়ালা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এই কর্ম সম্পাদন করতে গিয়েও তাঁকে কোনো ক্লান্তিতে পায়নি। তাই কোনো প্রকার বিশ্রাম বা আরাম করারও প্রয়োজন পড়েনি। ইরশাদ হয়েছে–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ۝

আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উভয়ের অন্তর্বর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে; আমাকে কোনো ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। *[কাফ : ৫০ : ৩৮]*

একজন সুস্থস্বভাব ও মুক্তচিন্তার মানুষ বিস্মিত হতে পারে এই কারণে যে, সেই মহান শক্তিমান, পরাক্রমশালী আল্লাহ, যার বৈশিষ্ট্য হলো–

لَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا

আকাশ ও পৃথিবীর সংরক্ষণ কর্ম তাকে ক্লান্ত করে না।

لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ

তাকে তন্দ্রা কিংবা ঘুম স্পর্শ করে না।

তার সম্পর্কে আবার এই সাফাই বর্ণনার কী প্রয়োজন ছিলো? তিনি আকাশমণ্ডলী আর পৃথিবী সৃষ্টি করে ক্লান্ত হননি– এ কথা বলার কী দরকার ছিলো? কিন্তু বাইবেলের পাতায় যখন এ কথা দেখতে পাই, আল্লাহ তায়ালা ছয় দিনে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করে সপ্তম দিন বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন।[৩] বাইবেলের আরবী অনুবাদের শব্দগুলো হলো–

فَاسْتَرَاحَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ

২. আবদুল মাজেদা দরিয়াবাদী (রহ.) কৃত তাফসীর মাজেদীরা وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩. পয়দায়েশ : ২ : ২

সপ্তম দিন তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করেন।[১]

কিংগ জেমস-এর নির্ভযোগ্য ইংরেজী অনুবাদের শব্দগুলো এমন–

AND HE RESTED ON SEVENTH DAY ALLHIS WORK WHECH HE HAD MADE.[2] মূলত এসব ভাষ্য পাঠ করার পরই কুরআনে কারীমের বক্তব্য وما مسنا من لغوب (আমাকে কোনো ক্লান্তি স্পর্শ করেনি) এর মর্ম ও গুরুত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে, এই আয়াত দ্বারা কোন মূর্খতা ও দুঃসাহসিকতার প্রতিবাদ করা হয়েছে। কত বিশাল জটিল ভুলের অপনোদন করা হয়েছে আয়াতের এই ক্ষুদ্রাংশের মাধ্যমে। এ এমন এক ভুল, যার মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দাবিদার একটি জাতি হাজার হাজার বছর ধরে করে আসছিলো। সম্ভবত ওই ভুলের স্মারক চিহ্ন হিসেবেই আজো তারা শনিবারে 'ছুটি' পালন করে। ভুল সবই ভুল।

৩. হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে খৃষ্টানদের আকীদাকে পবিত্র কুরআন তিনভাবে বর্ণনা করেছে।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۝

যারা বলে, ঈসা ইবনে মারয়ামই আল্লাহ– নিশ্চয়ই তারা কাফের। *[মাইদা : ৫ : ১৭]*

وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ۝

খৃষ্টানরা বলে, মসীহ আল্লাহ পুত্র। *[তাওবা : ৯ : ৩০]*

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ ۝

তারা বলে, আল্লাহরও সন্তান আছে। (না) আল্লাহ তো পবিত্র। *[বাকারা : ২ : ১১৬]*

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۝

১. মনে হয় খৃষ্টান আলেমগণ এবং অনুবাদকমণ্ডলী পরে তাদের এই ভুলকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তাদের এই বক্তব্য দ্বারা আল্লাহকে কতটা দুর্বল প্রমাণিত করা হয়েছে। তাই তারা তাদের নীতিমালা মুতাবিক এসব অনুবাদকে পুনঃসম্পাদনা করার সময় এতে ভাষাগত কিছুটা পরিবর্তন করেছেন। বৃটিশ এ্যান্ড ফরেন সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৫৮ ঈ.) যে এডিশনটি আমাদের সামনে আছে, তাতে উপরোক্ত শব্দাবলীর স্থলে লেখা আছে 'এবং তিনি তার সকল কর্ম যা তিনি করছিলেন সম্পাদন করার পর সপ্তম দিন অবসর লাভ করেন।'

২. Gen 2:2

এবং তারা বলে, আল্লাহর সন্তান আছে। (এই জাতীয় কথা যারা বলো) তোমরা তো (মুখে) খুবই মন্দ কথার অবতারণা করেছো।' *[মারয়াম : ১৯ : ৮৮–৮৯]*

وَمَا يَنۡۢبَغِي لِلرَّحۡمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ۝

সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর জন্য শোভা পায় না। *[মারয়াম : ১৯ : ৯২]*

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ ۝

বলো, সকল প্রশংসা তাঁর, যিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর রাজত্বে কোনো শরীক নেই। *[ইসরা : ১৭: ১১১]*

وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۝

এবং তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করুন, যারা বলে আল্লাহর সন্তান আছে। *[কাহফ : ১৮ : ৪]*

একি শুধু বর্ণনাভঙ্গির পার্থক্য? এসব আয়াতের মর্ম ও লক্ষ্য কি এক? কিন্তু খৃষ্টবাদের নানা দল উপদলের ইতিহাস, তাদের আকীদা-চিন্তার সার্বিক পর্যালোচনা করলে এবং এ যাবত প্রকাশিত তাদের ধর্মচিন্তার আলোকে বিচার করলে মনে হয়, এসব আয়াতে শব্দগত সূক্ষ্ম যে পার্থক্য বিরাজমান, তাতেও বিশেষ তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। বিশেষভাবে আমরা যখন জানতে পারি, খৃষ্টানদের মধ্যে বিশেষ একটি দল রয়েছে Adoptionist নামে যারা হযরত ঈসা (আ.)কে সরাসরি আল্লাহর ঔরষজাত সন্তান মনে করে না। তারা বরং শুধু এতটুকু মনে করে, (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসাকে (আ.) পালকপুত্র (Adopt) হিসেবে বরণ করে নিয়েছেন।

এখানেই কুরআনে কারীমের মুজিযা স্বীকার করতে হয়। এক উম্মী নিরক্ষর নবী আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে হেজাযের মাটিতে বসে ওহীর আলোকে এই সত্য উন্মোচন করে দিয়েছেন। তার বর্ণনায় এই সূক্ষ্ম তত্ত্বটিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যা কিনা অনেক শিক্ষিত খৃষ্টানও জানতো না। এ সম্পর্কে মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রহ.) লিখেন–

"খৃষ্টানদের মধ্যে Adoptionist নামে একটি বিশাল দল ছিলো। তাদের মৌলিক ও কেন্দ্রীয় আকীদা বিকাশের জন্যে এই তাবান্নিয়্যাত, পোষ্যপুত্র গ্রহণ কিংবা Adoptionism শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছিলো। তাদের এই আকীদার সারমর্ম

হলো– মহান খোদা তাকে পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করত স্বীয় উলূহিয়্যাত মালিকিয়্যাত তথা প্রভু ও শাসকসহ সকল ইলাহী গুণের অংশীদার করে নিয়েছেন। তাদের এই আকীদার প্রমাণ (১৮৫ ঈসায়ী) ইতিহাসেও পাওয়া যায়। অষ্টম শতাব্দীতে রোমের ফাদার এই তন্ত্রকে নাস্তিক্যবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। কুরআনের উল্লেখিত আয়াতে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে খৃষ্টানদের এই দলের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।[১]"

বলা বাহুল্য, ইহুদী খৃষ্টানদের ধর্মতত্ত্ব, ভেতরের আকীদা ও ঘটনাবলী সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ব্যতীত কোনো মানুষের পক্ষে কি এমন সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর কথা বলা সম্ভব? আদৌ সম্ভব নয়। এতেই প্রমাণিত হয়, এটা আলিমুল গায়েব তথা অদৃশ্য জ্ঞানের অধিপতি মহান রাব্বুল আলামীনের কিতাব। এতে কোনো সংশয় বা সন্দেহের অবকাশ নেই। তাঁর ইলম ও জ্ঞানে নেই কোনো ত্রুটি ও দুর্বলতা।

وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ . لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ
تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۝

এটা অবশ্যই এক মহিমাময় গ্রন্থ, কোনো মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না– অগ্র থেকেও না, পশ্চাৎ থেকেও না। এটা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। *[হা-মীম আস-সাজদা : ৪১ : ৪১-৪২]*

---

[১]. তাফসীরে মাজেদী, ১ম খণ্ড : ২০৪ পৃ.

রোমকদের জয় : কুরআনে কারীমের একটি উল্লেখযোগ্য ভবিষ্যদ্বাণী

ভবিষ্যদ্বাণীর তাৎপর্য, স্বাতন্ত্র্য, নতুনত্ব ও তার বর্ণনাভঙ্গি

ভবিষ্যদ্বাণী কুরআনে কারীমের একটি অলৌকিক দিক। আল্লাহর অসীম শক্তি বলে অস্বাভাবিকভাবে সংঘটিত ঘটনা, যা নবীর সত্যতাকে প্রমাণ করে, তাকেই মু'জেযা বলে। এ জাতীয় ঘটনার আক্ষরিক কারণ ও বিশ্লেষণ করতে সদাই মানুষের বিবেক বুদ্ধি অক্ষমতা ও অপারগতা প্রকাশ করতে বাধ্য হয়। বিশেষ করে যে অবস্থায় এসব ঘটনা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিলো, অতঃপর যেভাবে তা বাস্তবে সংঘটিত হয়েছে, তা সত্যিই বিস্ময়কর। এসব ভবিষ্যদ্বাণীতে দু'ধরনের মু'জেযা নিহিত রয়েছে। প্রথমত বাহ্যত এক অসম্ভব বিপরীত পরিবেশে এসব ঘটনা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিলো, যা সম্পূর্ণ ধারণাতীত মনে হচ্ছিলো। আর বড় বড় ঘটনা সম্পর্কে শুধু একটি মাত্র ঘোষণা ছিল। দ্বিতীয়ত পরবর্তীতে ঠিক ঘোষণামাফিকই বাস্তবে ঘটে গেছে প্রতিটি ঘটনা, যা রীতিমতো বিস্ময়ের তরঙ্গ সৃষ্টি করেছে মানুষের মন ও চিন্তায়।

এসব ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী স্পষ্ট বিস্ময়কর ঘটনা হলো, রোমকদের বিজয় লাভ সম্পর্কিত পূর্ববাণী। বিস্ময়কর এই ভবিষ্যদ্বাণীর শব্দগুলো সরাসরি কুরআনের ভাষায় প্রথমে পড়ুন–

الم ٥ غُلِبَتِ الرُّومُ ٥ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ٥ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ٥ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ٥ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ٥

আলিফ-লাম-মীম! রোমকগণ পরাজিত হয়েছে, নিকটবর্তী অঞ্চলে। কিন্তু তারা তাদের এই পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে, কয়েক বছরের মধ্যেই। পূর্বের ও পরের ফয়সালা

আল্লাহরই। আর সেদিন মুমিনগণ হর্ষোৎফুল্ল হবে, আল্লাহর সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। এটা আল্লাহরই প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। তারা তো পার্থিব জীবনের উপরের দিকটাই জানে আর পরকাল সম্পর্কে তারা গাফেল। *[রূম : ৩০ : ১-৭]*

উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীর বর্ণনাভঙ্গি, আগপর পরিস্থিতি সবকিছুই প্রমাণ করে, এটা কুরআন ও হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি মু'জেযা। রাসূল ও কুরআনের সত্যতার একটি প্রমাণ হিসেবেই এটিকে পেশ করা হয়েছিলো তখন। সেই সাথে এ ছিলো অস্বাভাবিক ও অসাধারণ ঘটনা। কারণ, রোমকদের এই বিজয় সাধিত হয়েছিলো কঠিন এক পরাজয়ের পর। এই আয়াতের প্রথমে দুই স্থানে সেই পরাজয়ের কথাও উদ্ধৃত হয়েছে।

ঘটনার বিস্ময়কর আরেকটি দিক হলো, বিজয়ের এই বিস্ময়কর ঘটনাটি ঘটবে আগামী ৯ বছরের ভেতর। এই সামান্য সময়ের মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত লীন হয়ে যাওয়া বিক্ষত একটি জাতির জন্য ঘুরে দাঁড়ানো এবং আরেকটি বিজয়ী শক্তিশালী জাতিকে পরাজিত করে তাদের পিঠের-উপর বিজয়ের পতাকা ওড়ানোর জন্য এই সময় মোটেও যথেষ্ট নয়। অন্যান্য আয়াতে জোর দিয়ে বলা হয়েছে, এটি একটি বিস্ময়কর ঘটনা। বাহ্যিক উপায় উপকরণের ধার ধারে নয়। বরং সাধারণ ধরা বাঁধা নিয়মের বিপরীতে, চেনা জানা চিরাচরিত পদ্ধতির বাইরে সম্পূর্ণ নতুনরূপে সংঘটিত হবে এই ঘটনা।

لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ

আগ-পর সকল ফয়সালা আল্লাহরই। এতে এই তত্ত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, আল্লাহ সদাই সকল এখতিয়ারের অধিকারী। যখন যাকে খুশী জয়ী করেন। যাকে খুশী পরাজিত করেন। যাকে খুশী জীবন দান করেন, যাকে খুশী মরণ দেন। তাঁর কোনো সময়ের প্রয়োজন হয় না। কোনো অবস্থা ও পরিবেশের অপেক্ষা করতে হয় না তাঁকে। রাত দিনের পরিবর্তন তাঁরই নিয়ন্ত্রণে।

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ ٥
وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٥

বলো, হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দান করো এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নাও; যাকে ইচ্ছা তুমি পরাক্রমশালী করো আর যাকে ইচ্ছা হীন করো। কল্যাণ তোমারই হাতে। নিশ্চয়ই তুমি সকল বিষয়ে শক্তিমান। তুমিই রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে পরিণত করো। তুমিই মৃত থেকে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটাও, আবার জীবন্ত থেকে মৃতের আবির্ভাব ঘটাও। তুমি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনোপকরণ দান করো। *[আলে ইমরান : ৩ : ২৬-২৭]*

একটু অগ্রসর হয়ে ইরশাদ হয়েছে, এই ঘটনা একান্তই আল্লাহর অনুগ্রহে ঘটবে। আর মুসলমানগণ ইরানী পারসিকদের তুলনায় রোমকদের নিকটতম হওয়ার কারণে এবং কাফের মুশরিকদের টিপ্পনীর ফলে যে পরিমাণে কষ্ট তাদের হয়েছিলো তার চেয়ে অনেক গুণ বেশী তারা আনন্দিত হবে।

وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. بِنَصْرِ اللَّهِ ٥

সেদিন আল্লাহর সাহায্যে মুমিনগণ হর্ষোৎফুল্ল হবে।

এও হতে পারে, এতে এমন কোন ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যাতে স্বয়ং মুসলমানদের জন্যই বিশাল ও সিদ্ধান্তমূলক কোন আনন্দের বার্তা রয়েছে যা বদরের ময়দানে ঠিক সেদিনই ঘটেছিলো– যেদিন রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করেছিল।[১] কেউ হয়তো ভাবতে পারেন, আচ্ছা, আল্লাহ তায়ালা রোমক খৃষ্টানদেরকে জয়ী করবেন কেন? কেন তাদেরকে বিশেষ সাহায্যে ভূষিত করবেন? ইরশাদ করেছেন–

يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ

তিনি যাকে খুশী সাহায্য করেন।

অতঃপর স্বীয় এমন সব গুণাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন, যার সাথে এই বিস্ময়কর ঘটনার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। এই বিস্ময়কর ঘটনা সংঘটনের সম্ভাব্যতার প্রমাণ হিসেবে বলেছেন–

وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে ইবনে কাছীর

এবং তিনি পরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু।

এ ঘটনা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে এই দুটি গুণের সবিশেষ বিকাশ ঘটেছে ইরানী পারসিকরা বিজয়ের নেশায় উন্মাদ ছিলো। তাদের ক্ষেত্রে আল্লাহর শক্তি, বিজয় ও পরাক্রম গুণের জ্বলন্ত বিকাশ ঘটেছে। পক্ষান্তরে রোমকদের শরীর ও অন্তর আঘাতে আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। তাদের দেশ ও রাজত্ব ত্রাহি ত্রাহি করছিলো। মৃত্যুমুখে কাতরাচ্ছিলো তাদের রাজ্য। তাদের পঞ্চাশ হাজার নাগরিক পারসিকদের হাতে বন্দী। নানাভাবে লাঞ্ছিত হচ্ছে তাদের আপনজনরা প্রতিদিন। আল্লাহর রহমত উথলে উঠেছিলো তাদের ভাগ্যে। আর পারসিকদের সাথে যুদ্ধে রোমকদের পরাজয়ের ফলে আহত ছিলো যেসব মুসলমানের অন্তর, এতে তাদের জন্যে ছিলো সান্ত্বনা ও আনন্দের শুভ সংবাদ। অধিকন্তু স্বয়ং তাদের জন্যও এতে নিহিত ছিলো এক অভাবনীয় বিজয়ের শুভ ইঙ্গিত। এ বিষয়টিকেই আরেকটু শক্ত করার জন্য ঘোষিত হয়েছে–

لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ

আল্লাহ তায়ালা তার প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।

সবশেষে বলেছেন, এ ঘটনা স্থূল জ্ঞান, বাহ্যিক ও প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতার পরিপন্থী ঘটবে। তাই ঘটার পূর্বে অনেকেই হয়তো বিশ্বাস করতে পারবে না। তারা তাদের বাইরের জ্ঞান দিয়ে এ সত্যকে মাপতে পারবে না।

وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

তবে অধিকাংশ লোকই জানে না। *[নামল : ২৭ : ৩৮]*

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ٥

এরা তো পার্থিব জীবনের বাইরের দিকটাই বুঝে আর পরকাল সম্পর্কে তো এরা পূর্ণ গাফেল। *[ইউনুফ : ১০ : ৯২]*

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

এখন আমাদেরকে দেখতে হবে, সে এমন কি প্রতিকূল পরিস্থিতি ছিলো, যার কারণে রোমকদের বিজয় ছিলো এক অসম্ভব ও অচিন্তনীয় বিষয়? অতঃপর কুরআন অসাধারণ এই বিষয় সম্পর্কে অসামান্য গুরুত্বের সাথে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে? কুরআনের সত্যতার নিদর্শন হিসেবে উপস্থাপন করেছে এই ঘটনাকে? কেননা, একটি দাস জাতির স্বাধীনতা লাভ করা, একটি পরাজিত ও নিষ্পেষিত জাতির ঘুরে দাঁড়ানো, একটি ভেঙ্গেপড়া দেশ উঠে দাঁড়ানো, এক রাষ্ট্র অপর

রাষ্ট্রকে পরাজিত করা– এসব ইতিহাসের কোনো বিরল ঘটনা নয়। অথচ কুরআন একে এক অসাধারণ বিরল ও বিস্ময়কর ঘটনা হিসেবে উপস্থাপন করেছে।

এই প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে প্রথমেই আমাদেরকে জানতে হবে এই ঘটনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, যে প্রেক্ষাপটের কারণে এই ঘটনা স্বীকৃতি লাভ করেছে মু'জেযার। জানতে হবে, সত্যিই কি রোমকরা এতোটা পরাজিত ছিলো? সত্যিই কি তারা এতোটা হিংস্রতা ও পাশবিকতার শিকার ছিলো? সত্যিই কি পারসিকরা এতো শক্ত বিজয় লাভ করেছিলো? পারসিকরা কি আসলেই রোমকদের প্রতিটি অঞ্চলে প্রদেশে এতোটা শক্ত শাসন গড়ে তুলেছিলো যে, নয় বছরের মাথায় এই জয়ীরা পরাজিত হওয়া এক অসাধারণ বিস্ময়কর ঘটনা? একেবারে মুজেযা হিসেবে স্বীকৃত হবে সে ঘটনা! তাতে থাকবে আল্লাহ্ তায়ালার অলৌকিক শক্তির হাত! তার কি কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা ছিলো না? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা ইউরোপিয়ান ঐতিহাসিকদের বক্তব্য ও বর্ণনা থেকে দেয়ার চেষ্টা করবো। এক্ষেত্রে আমাদের প্রধান উৎস হলো বিখ্যাত ইংরেজ ইতিহাসবিদ সাহিত্যিক এডওয়ার্ড গিবন (Adward Gibbon)-এর ইতিহাস গ্রন্থ 'রোমের পতন'- Decline and Fall of the Roman Emaire.

ইরানী হামলার কারণসমূহ

খসরু[১] (নওশেরওয়ার পৌত্র ও হরমুজের পুত্র) বাহরাম (গোর) থেকে পালিয়ে গিয়ে রোমে আশ্রয় নিয়েছিলো এবং সেই হরমুজকে সরিয়ে সামানের সিংহাসন দখল করেছিলো। শেষে এই খসরুই পালিয়ে গিয়ে রোম দেশে আশ্রয় নেয়।[২] এটা ছিলো শাহানশাহ মারস (Maurice)-এর শাসনামলের ঘটনা।[৩] শাহানশাহ তাকে লুফে নেন ও রাজকীয় মর্যাদায় ভূষিত করেন এবং তাকে নিজের পুত্র হিসেবে বরণ করেন।[৪] বিখ্যাত রোমান জেনারেল নারসেজ (Narses)-এর অধীনে একটি বিরাট সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেন। এই বাহিনী স্বয়ং ইরানীদের সাহায্যেই ৫৯০ খৃষ্টাব্দে খসরুকে তার পূর্বপুরুষদের আসীন করে। খসরু ফিরে পান বাপ দাদার সিংহাসন। তিনি হৃদয়বান মারসের এই অনুগ্রহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ খসরু সর্বদাই মারসকে দয়ালু পিতা

[১]. আরবী ইতিহাসে কিসরা ইবরাভীয আর ইংরেজী ইতিহাসে Chosrose বলা হয়।
[২]. বিস্তারিত জানার জন্য আরবী ও ফার্সি ইতিহাস গ্রন্থসমূহ দেখা যেতে পারে।
[৩]. এর নাম আরবী গ্রন্থাবলীতে موريقس আর ইংরেজী গ্রন্থাবলীতে আছে Maurice.
[৪]. ঐতিহাসিক মাসউদীর বর্ণনা মতে তার সাথে শাহানশাহ স্বীয় কন্যা 'মারিয়া'কে বিয়ে দেন।

হিসেবে শ্রদ্ধা করতে থাকেন। রাজ্যাধিপতি মারসের মৃত্যু পর্যন্ত ইরান আর রোমের মধ্যে আন্তরিক বন্ধুপ্রতীম সম্পর্ক বজায় থাকে। এতে করে রোমকরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নানা ধরনের সুবিধাও লাভ করতে থাকে।

৬০২ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। ফকস (Phocas) নামের এক সেনাপতি রোম সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। সে সম্রাটের পরিবার বংশসুদ্ধ নির্মম ও নির্দয়ভাবে হত্যা করে সিংহাসন দখল করে নেয়। উভয় দেশের পূর্ব বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও বহুবিধ ভ্রাতৃপ্রতীম রীতির প্রেক্ষিতে রোমের নতুন রাজা বিষয়টি ইরান সম্রাটকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো জরুরি মনে করেন। এতদুদ্দেশ্যে লেলিসকে (Lilius) স্বীয় দূত বানিয়ে খসরুর দরবারে প্রেরণ করেন। আর এই লেলিসই ইরান সম্রাটের হৃদয়বান অভিভাবক রোম সম্রাট মারস ও তার সন্তানদের মাথা এনে ফকস এর সামনে রেখেছিলো। অতঃপর এ পাষণ্ড রোমক দূতই যখন ইরান সম্রাটের সামনে দূতালীর পয়গাম নিয়ে উপস্থিত– ঘটনা বিস্তারিত জানার পর তিনি যারপরনাই ক্ষুব্ধ হন এবং দূতকে বন্দী করে ফেলেন। তিনি নতুন প্রশানকে স্বীকৃতি দিতে স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করেন। বরং পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করে দিলেন, তিনি তার হৃদয়বান পিতার প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর। এই ভদ্রোচিত আবেগ ও প্রতিশোধ স্পৃহাকে মাগিয়োনসহ বিভিন্ন ইরানী প্রাদেশিক গভর্নরদের ধর্মীয়, জাতীয় ও সাম্প্রদায়িক মানসিকতা আরো ক্ষিপ্ত করে তুলে। অবশেষে খসরু ৬০৩ খৃষ্টাব্দে রোমের উপর হামলা করে বসেন।[১]

ইরানের বিস্তীর্ণ বিজয়

ফক্স রোমক প্রধান জেনারেল নরসেজকে (Narses)কে কনস্টান্টিনোপোলের বাজারে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে। তখন রোম সাম্রাজ্যে তার চেয়ে ভালো ও দক্ষ আর কোন সেনা অধিনায়ক ছিলো না। দক্ষ কুশলী এই সেনাধ্যক্ষের হত্যার পর রোমক সৈন্যদেরকে হাতির পায়ের নিচে ফেলে পিষ্ট করা হয়। এদিকে খসরু প্রথমেই রোমকদের সীমান্ত প্রাচীর ভেঙ্গে দিয়েছিলো। সে ফুরাত নদী পাড়ি দিয়ে প্রথমেই সিরিয়ার শহরগুলো দখল করে নেয়। হেরাপ্লিস (Hieapolis), চালস (Chaleis) ও হালব (সিরিয়ার একটি শহর) পর্যায়ক্রমে দখল করে বাইজান্টাইন রাষ্ট্রের রাজধানী এনতাকিয়া জয় করে নেয়।

ইরানের বিজয় বয়ে চলে দীপ্তযৌবনা স্রোতস্বিনীর ন্যায়। মূলত এ বিজয় ছিলো রোমকদের পতন, অধঃগতি আর ফক্স-এর অযোগ্যতার জ্বলন্ত স্বাক্ষর।

[১]. এটা ছিল নবুওয়তের সাত বছর আগের ঘটনা

ইরানীরা এরপর ক্যাপেডেসিয়া[২] (Cappadacia)-এর রাজধানী কায়সারিয়া দখল করে নেয় খুবই সহজে। তারপর দামেশক, আল-খলিল, পূর্ব জর্দান এবং জেরুজালেম দখল করে নেয়। (খৃষ্টানদের বিশ্বাস মতে) মাদফানে ঈসা- ঈসার সমাধিস্থল হেলিনা ও কনস্টান্টিনোপোলের ঐতিহ্যবাহী শানদার গির্জা জ্বলে ভস্মীভূত হয়। তিনশ' বছরের ধর্মীয় ঐতিহ্য সঞ্চয় এক দিনে শেষ। মূল ক্রুশ (True Cross) ইরানে স্থানান্তরিত হয়। এতে নির্মমভাবে মারা যায় নব্বই হাজার খৃষ্টান।

ইরান সিরিয়ার পর মিশর দখল করে নেয়। হাবশা থেকে তারাবলুস পর্যন্ত ইরানী সাম্রাজ্য ছড়িয়ে পড়ে। রোমের নব আবাদ ভূমি থেকে আফ্রিকার দখলকৃত অঞ্চলগুলো ইরানী শাসনের মুঠোয় এসে স্থির হয়। ইরানী বিজেতা সেকান্দরের অনুকরণে লিবিয়ার মরু অঞ্চলের পথও ফিরে আসে তাদেরই হাতে। ইরানী সৈন্যদের একটি অংশ ফোরাত থেকে বাসফোর্স (Basphorus)সহ চালসিডন (Chalcedon) পর্যন্ত দখল করে নেয়। কনস্টান্টিনোপোলের নাকের ডগায় দশ বছর পর্যন্ত ইরানী ক্যাম্প বহাল থাকে। তখন যদি খসরুর কাছে নৌশক্তি থাকতো, তাহলে সে ইউরোপের অন্য প্রদেশগুলোও দখল করে নিতে পারতো।

হেরাক্লিয়াসের সিংহাসন দখল

ঠিক যখন রোম সাম্রাজ্য মরণযুদ্ধে অবতীর্ণ, তখনই আফ্রিকার গভর্নর হেরাক্লিয়াস (Heraclius) ফক্সের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসেন। অতঃপর ৬১০ খৃষ্টাব্দে ফক্সকে হত্যা করে পতনোন্মুখ রোম সাম্রাজ্যের ভার নিজ হাতে তুলে নেন। সিংহাসনে আরোহণ মাত্রই যে সংবাদ শুনতে পান, তাহলো এনতাকিয়ার পতন।

'ফক্স'-এর হত্যার ঘটনায় খসরুর প্রতিশোধের আগুন নিভে যাওয়ার কথা ছিলো। খসরু হেরাক্লিয়াসের কাছে কৃতার্থ হবে এটাই ছিলো প্রত্যাশিত। কারণ, হেরাক্লিয়াস তার হৃদয়বান পিতার খুনীকে হত্যা করেছেন। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। কেননা, এতদিনে ইরানী সম্রাটের বাসনা বদলে গেছে। সে তার রক্তক্ষয়ী হামলা অব্যাহত রাখে। কাঙ্ক্ষিত বিজয়কে তার শেষ প্রান্তে নিয়ে যায়।

[২]. ক্ষুদ্র এশিয়ার ২৫০ মাইলের চেয়ে কিছু কম প্রস্থ একটি উঁচু অঞ্চল। যার পূর্বে টারস পার্বত্যাঞ্চল ও ফুরাত নদী, পশ্চিমে গালিশিয়া ও লায়কোনিয়া, উত্তরে বাস্তসিন আর দক্ষিণে টারস পার্বত্য অঞ্চল। (এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা)

রোমকদের সমস্যাবলী

৬১৬ খৃষ্টাব্দে রোমকদের পতন পূর্ণাঙ্গতায় পৌছে। তারা তাদের বিশাল সাম্রাজ্য ইরানীদের হাতে খুইয়ে বসে। পশ্চিমে ইরানীদের হাতে সাধিত এই অসামান্য আঘাতের বাইরেও নানা দিক থেকে আক্রান্ত ছিলো তারা। সমগ্র ইউরোপাব্যাপী জ্বলছিলো বিদ্রোহের দাবানল। অস্ট্রিয়ার সীমান্ত থেকে তাদারলুসের প্রাচীর অবধি আওয়ার্স (Auars) চালাচ্ছিল অত্যাচারের পর অত্যাচার।

ইটালীয় যুদ্ধে নিষ্পাপ যে মানব সন্তানদের রক্ত প্রবাহিত হয়েছিলো বর্ষার পানির মতো, তা এখনো শুকায়নি। ইতোপূর্বে পেন্সোনিয়ার (Pansonia) পবিত্র ময়দানে পুরুষ বন্দীদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। নারী ও শিশুদেরকে দাস-দাসীতে পরিণত করা হয়েছে। রোম সাম্রাজ্য কনস্টান্টিনোপোলের প্রাচীরসমূহ, গ্রীক, ইটালী ও আফ্রিকার কিছু অবশিষ্ট অংশসহ এশীয় সীমান্তের কিছু সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা থেকে ট্রেবিজোন্ডের (Trebizond) মধ্যে বাঁধা পড়ে থাকলো।

মিশর পতনের পর রাজধানীতে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী হামলা করলো নতুন বিক্রমে। কনস্টান্টিনোপোলের খাদ্য আসতো মিশর থেকে। মিশর পতনের পর খাদ্য সরবরাহের সে পথ রুদ্ধ। 'কুসতুনতীন'-এর শাসনামল (৩০৩ ঈসায়ী) থেকেই কনস্টান্টিনোপোলে সাধারণভাবে খাদ্য বিতরণ করা হতো। উদ্দেশ্য যাতে মানুষ রাজধানীতে বসবাস করার প্রতি আকৃষ্ট হয়। খৃষ্টাব্দ ৬১৮ সালে এই অবরোধের ফলে সাধারণ ও ব্যাপকভাবে এই খাদ্যবিতরণ অপারগতাহেতু বন্ধ হয়ে যায়।

হেরাক্লিয়াসের কর্মকৌশল

হেরাক্লিয়াসের জীবনীকারগণ এ বিষয়ে একমত, এসব দুর্ঘটনা ও চড়াই উৎরাই সত্ত্বেও হেরাক্লিয়াসের মধ্যে কোনো আবেগ উচ্ছ্বাস প্রেরণা ও প্রাণ ছিলো না। সে তার উভয় দৃষ্টি মেলে রোম সাম্রাজ্যের পতন দেখে যাচ্ছিলো নীরব দর্শকের মতো। গ্যাবনের ভাষায় 'হেরাক্লিয়াস তার শাসনামলের সূচনা ও শেষে খুবই নির্জীব, নির্লিপ্ত, আরামপ্রবণ, সংশয়বাদী, স্বীয় জাতির চরম দুর্দিনে আত্মমর্যাদাহীন এক কাপুরুষ দর্শক ছিলো মাত্র।'

কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী

খৃষ্টাব্দ ৬১৬ সালের বিশাল রোম সাম্রাজ্যের এই ভয়াবহ মরণ-মুহূর্তে কুরআনে কারীম ভবিষ্যদ্বাণী করেছে, রোমকরা আগামী নয় বছরের ভেতরেই বিজয় লাভ করবে। ঐতিহাসিক গ্যাবন এ মর্মে লেখেন–

'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরানী পারসিকদের বিজয়ের যৌবন মুহূর্তে এ মর্মে ভবিষ্যদ্বাণী করেন, কয়েক বছরের মধ্যেই রোম পুনরায় বিজয়ের পতাকা উড়াবে। যখন এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, তখন এর চাইতে অধিক অযৌক্তিক আর কোন কথাই ছিলো না। কারণ, হেরাক্লিয়াসের প্রাথমিক ১২ বছর রোমের পতন ও ধ্বংসের চূড়ান্ত ঘোষণা উচ্চারণ করেছিলো।'[১]

নবুওয়তের পঞ্চম সালের কথা। ইরানীদের এই মহাবিজয় আর রোমকদের এই লাঞ্ছনাকর পতনে মক্কার কাফের সম্প্রদায় আনন্দে তালি বাজাচ্ছিলো। ইরানী পারসিকদের এই তরঙ্গায়িত বিজয়কে নিজেদের বন্ধুদের বিজয় হিসেবে নিজেদের জন্য সুলক্ষণ মনে করে হর্ষোৎফুল্ল হচ্ছিলো। কারণ, ইরানী পারসিকরাও ছিলো মুশরিক। আর মক্কার কাফের সম্প্রদায় ছিলো মুশরিক। তারা শিরকের সূত্রে একে অপরের আত্মীয়।

যখন সূরা রূমের প্রাথমিক আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়, মক্কার মুশরিকরা যখন একথা জানতে পারে, তখন তারা এটাকে এক অসম্ভব বাগাড়ম্বর মনে করে মুসলমানদের সঙ্গে এই মর্মে চুক্তি করে বসে, যদি সত্যিই রোমকরা জয়ী হয় মুসলমানদের কিছু উট দেবে। আর যদি বাস্তবে তা না ঘটে, তাহলে মুসলমানগণ উটের চুক্তিতে হেরে যাবে। হযরত আবু বকর (রা.) যিনি এই চুক্তি ও শর্তে শরীক ছিলেন– পাঁচ বছরের সময় বেঁধে দিলেন। বিষয়টি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারেন, তখন তিনি বলেন, আয়াতে উল্লিখিত 'বিযউন' শব্দটি তিন থেকে নয় বছর পর্যন্ত সময়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। তখন হযরত আবু বকর (রা.) পাঁচ বছরের স্থলে নয় বছরের শর্ত বেঁধে দেন।[২]

ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকাশ

উল্লিখিত বিপদের ঘনঘটায় পড়ে হেরাক্লিয়াস চিন্তা করলো, সে কনস্টান্টিনোপোল ছেড়ে কারথিজ[৩] (Carthage) চলে যাবে। সেখানেই স্বীয় শাসনকেন্দ্র স্থাপন করবে। কারণ, সেটা তুলনামূলক নিরাপদ ও সুরক্ষিত অঞ্চল। হেরাক্লিয়াস কৃতসংকল্প। রাজমহলের ধনভাণ্ডার, সোনাদানা, মুক্তা জহরত বোঝাই বিশালায়তন জাহাজ প্রস্তুত। ঠিক এই সময়ে বিতরিক তাকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করে এবং সাহস যোগায়। তখন সেন্ট সোফিয়াতে এসে এই

---

১. তারিখে যাওয়ালে রোমা, ৩য় খণ্ড, ৩০৩ পৃ. ১৮৯০ ঈ. সংস্করণ।

২. তিরমিযী শরীফ, কিতাবুত তাফসীর

৩. বর্তমান তিউনিসের নিকটবর্তী এই শহরকে আরবী ইতিহাস قرطاجنة নামে স্মরণ করে।

মর্মে শপথ গ্রহণ করে, সে বাঁচলেও তাদের সাথেই বাঁচবে আর মরলেও তাদের সাথে মরবে, খোদা যাদেরকে তার অধীন বানিয়েছেন।

রোমান শাসকের পরাজয় ও হীনমন্যতা অনুমান করার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট, সে একজন ইরানী লিডার। আর কয়েকজন রোমক পদস্থ কর্মকর্তার মাধ্যমে ইরান সম্রাটের কাছে ক্ষমা চেয়ে প্রাণের নিরাপত্তার জন্য আবেদন পাঠিয়েছিলো। ইরান সম্রাট তখন বলেছিলো, এতে আর কোন দূতালী নয়। আমি মনে করি স্বয়ং হেরাক্লিয়াসই বন্দী হয়ে আমার সামনে উপস্থিত। কিন্তু রোমক শাসন যতোদিন পর্যন্ত তার ক্রুশবিদ্ধ খোদাকে পরিত্যাগ করে সূর্য দেবতার পূজা না করবে, ততোদিন পর্যন্ত তাকে নিরাপত্তা দিতে পারবো না।

অবশ্য দীর্ঘ ছয় বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সে কনস্টান্টিনোপোলের বিজয় থেকে হাত গুটিয়ে নেয়। কিছু শর্তের ভিত্তিতে রোমকদেরকে নিরাপত্তা দান করে। শর্তগুলো হলো– প্রতি বছর এক হাজার স্বর্ণের ট্যালেন্ট, (Talents) এক হাজার পৌর ট্যালেন্ট, এক হাজার রেশমী পোশাক, এক হাজার ঘোড়া ও এক হাজার কুমারী নারী ইরান সম্রাটকে ট্যাক্স হিসেবে দিতে হবে। রোমকদেরকে ক্ষিপ্ত ও জাগ্রত করার জন্য, তাদের মৃত আত্মমর্যাদাবোধকে তাপিত ও শানিত করে তোলার জন্য এসব শর্ত হেরাক্লিয়াসের বেশ কাজে লেগেছিলো। হেরাক্লিয়াস তখন ধর্মযুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে বসে। যুদ্ধের খরচ বহন করার জন্য গির্জার স্থাবর সম্পদ ও অর্থকড়ি এই শর্তে ধার গ্রহণ করে, সে পরে সুদসহ তা পরিশোধ করে দেবে।

হেরাক্লিয়াসের মধ্যে আকস্মিক পরিবর্তন

হেরাক্লিয়াসের নির্লিপ্ত স্বভাব, মৃতপ্রায় শরীর আর পতিত সংকল্প হঠাৎ যেনো জেগে উঠলো নতুন প্রাণে, নতুন বিশ্বাসে, নতুন চেতনায়। জীবন তার সম্পূর্ণ বদলে গেলো। তখন আর হেরাক্লিয়াস অলস মৃতপ্রাণ আরামপ্রিয় বাদশাহ নয়। দীপ্ত সাহস, সজাগ অস্তিত্ব, উঁচু হিম্মত ও বিজেতা এক সিপাহসালার এখন। স্বীয় ঘুমন্ত মৃত জাতিকে হৃত দেশ ও হারানো সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারে বদ্ধপরিকর। স্বীয় ঘুমন্ত মৃত জাতিকে জাগিয়ে তুলতে সদা অস্থির এখন তার মনপ্রাণ বদন। ঐতিহাসিক গ্যাবন লিখেন–

'যেভাবে সকাল-সন্ধ্যার আচ্ছন্নতা সূর্যের আবির্ভাবে মুহূর্তে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, তেমনি মহলের আরকাডিউস ময়দানের সিজারে রূপান্তরিত হলো। হেরাক্লিয়াস ও রোমের সম্মান অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণভাবে রক্ষা পেলো।'[১]

---

১. তারীখে যাওয়ালে রোমা, ৭ম পৃ. লন্ডন, ১৯০৯ ঈসাব্দে প্রকাশিত

হেরাক্লিয়াস : সিপাহসালার, বিজেতা

হেরাক্লিয়াস প্রস্তুত। সঙ্গে বিশাল বীর্যবান বাহিনী। এশিয়ার পশ্চিম ও দক্ষিণ সমুদ্র অঞ্চলকে ডানে রেখে এসকান্দারিয়ার উপসাগরীয় অঞ্চলে সসৈন্য অবতরণ করেন। সামুদ্রিক শহরসমূহের কেল্লাগুলো মেরামত করেন। নতুন অবস্থা ও পথ সম্পর্কে বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেন। হযরত ঈসা (আ.)-এর অলৌকিক ব্যক্তিত্ব তুলে ধরে অগ্নিপূজকদের পূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণের দীপ্ত উদাত্ত আহ্বান জানান সকলের প্রতি। এই প্রভাবময় প্রাণোৎসারিত ভাষণের মাধ্যমে সকলের ভেতর প্রতিশোধ নেশা আর শত্রুতার স্পৃহা অগ্নিময় করে তোলেন। শুরু হয় নতুনপ্রাণে যাত্রা। সিলিশিয়া (Cilicia) জয় করার পর হেরাক্লিয়াস ক্যাপেডোশিয়ার (Cappadocia) পথে পা বাড়ান। কৃষ্ণসাগর এবং আরমেনিয়ার পর্বতমালা অতিক্রম করে হেরাক্লিয়াস ঢুকে পড়েন ইরানের হৃদয়ে। সুনির্বাচিত পাঁচ হাজার সিপাহীকে সঙ্গে করে কনস্টান্টিনোপোল থেকে পৌছে যান তারাবযোনে। তোরস ও গেন্দাযাকা শহর অতঃপর মোগানের অঞ্চলসমূহ জয় করে ফেলেন। প্রত্যয়ী খৃষ্টানরা 'মাগী' এবাদতখানা ভেঙ্গে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়। খসরুর মূর্তিগুলো আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলে। হযরত ঈসা (আ.)-এর কল্পিত সমাধির প্রতিশোধে 'যর' আশতর এর জন্মভূমি লাঞ্ছিত করা হয় প্রবল তাপে। পঞ্চাশ হাজার খৃষ্টান কয়েদীকে মুক্ত করা হয়। হেরাক্লিয়াস 'সাবাত' অঞ্চলে প্রবেশ করেন। তারপর চলে আসেন কাযবীন হয়ে ইস্পাহানের শহরগুলো পর্যন্ত। ইরানী শাসনব্যবস্থা ভারী শংকা ও বিপাকে পড়ে যায়। নীল প্রান্তর ও বাসফোর্স থেকে ফৌজ তলব করা হয়। সাহসী হেরাক্লিয়াস এই অমিত দুর্বার বাহিনীকেও পরাস্ত করে দেন। কুর্দিস্তানের পর্বতমালা অতিক্রান্ত করে দজলা পার হন। রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধের পর এসে সাবাতে পৌছেন। নিনভা রণাঙ্গনে এক সিদ্ধান্তমূলক লড়াই হয়। তারপর তিনি 'দসতজোরদ'-এ প্রবেশ করেন। ঐতিহাসিক শহর 'মাদায়েন' থেকে কয়েক মাইল দূর থেকে বিজেতার বেশে ফিরে আসেন কনস্টান্টিনোপোল।

পূর্ণতা পেলো ভবিষ্যদ্বাণী

ইরানী সাম্রাজ্য তছনছ হয়ে গেছে। অকল্পনীয় এক ঝড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে বিশাল শক্তিধর মুলুক। রোমকরা তাদের প্রাচীর সীমানা পেছনে ফেলে অনেকটা সামনে চলে গেছে এবার। ইরানীদের পদদলিত করে ইরান সাম্রাজ্যের হৃদয়ের উপর পতাকা গেড়ে দিয়েছে। এভাবেই খৃষ্টাব্দ ৬২৫ সালে অর্থাৎ হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে বদর যুদ্ধের সময়-ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষিত হবার পর ঠিক নবম বর্ষের

ভেতরে কুরআন মাজীদের এই মহান ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করে। ইতোপূর্বে দৃশ্যত যার কোন লক্ষ্যণ, উপকরণ ও উপাদান কিছুই ছিলো না এবং কেউ তা কল্পনাও করেনি।

আবার নির্জীব হেরাক্লিয়াস

ইউরোপিয়ান ঐতিহাসিক ও লেখকগণ এ বিষয়ে একমত, হেরাক্লিয়াসের সবচেয়ে উত্তম মর্যাদাপূর্ণ ও সফলকাল সেটাই, যে কালটা তিনি ইরানীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে কাটিয়েছেন এবং রোমকদের হারানো রাজ্য ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার করেছেন। হেরাক্লিয়াসের প্রাথমিক ও সমাপনী কালের সাথে মাঝের এই সময়টার কোনো মিল নেই। মনে হয় 'কুদরত' যেনো তাকে শুধু এই কাজটার জন্যেই জীবিত ও জাগ্রত করেছিলো। বিশাল ও তাৎপর্যপূর্ণ এ দায়িত্ব আঞ্জাম দেবার পর আবার সেই আরামপ্রিয় হেরাক্লিয়াস নিষ্প্রাণ কায়সার। ঐতিহাসিক গ্যাবনের ভাষায় 'রক্তমাখা সাধনা ও ত্যাগের বিনিময়ে হেরাক্লিয়াস যেসব প্রদেশ ও অঞ্চল ইরানীদের হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন, চোখের সামনে আবার সেইসব জনপদ আরবদের হাতে তুলে দিলেন।

ঐতিহাসিকগণ বিচলিত, নির্বাক। হেরাক্লিয়াসের জীবন এক বিস্ময়কর রূপান্তরে বিরল দর্পণ। জীবনের মাঝপথে পরিপক্ক যোগ্যতা, সাহসিকতা ও বিচক্ষণতা, আবার শুরু ও শেষে গাফলতি, অলসতা, আরামপ্রিয়তা, অযোগ্যতা, অক্ষমতা, অপরিপক্বতার কী ব্যাখ্যা হতে পারে? ঐতিহাসিকগণ বিস্মিত এখানে। তারা সামঞ্জস্যহীন, বিচিত্র বিরোধপূর্ণ এসব ঘটনার বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও সমাধান খুঁজেছেন প্রাণপণে। গ্যাবন লিখেন–

'বাইজান্টাইনী ঐতিহাসিকদের কর্তব্য ছিলো, হেরাক্লিয়াসের ঘুম ও জাগরণ, ঝিমিয়ে পড়া আবার রুদ্ররোষে জেগে ওঠার কারণ বর্ণনা করা। কালের এই বিশাল ব্যবধান পাড়ি দিয়ে আমরা শুধু এটুকু অনুমান করতে পারি, রাজনৈতিক দৃঢ়তার চাইতে তার ব্যক্তি সাহস ছিল বেশি। আর সে তার ভ্রাতুষ্কন্যা সারটেনিয়ার বিরল সৌন্দর্যে এতটাই মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েছিলো যে, অবশেষে তাকে নাজায়েয পন্থায় বিয়েও করে নিয়েছিলো। তাছাড়া সে তার উপদেষ্টাদের এই নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ পরামর্শকে মেনে নিয়েছিলো– একজন রাজার জীবন যুদ্ধের ময়দানে বিলিয়ে দেয়া যায় না। সম্ভবত সে ইরানী বিজেতার লাঞ্ছনাকর দাবির প্রেক্ষিতেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলো।

---

[১]. তারীখে যাওয়ালে রোমা, ৭ম খণ্ড, ৭৬-৭৭ পৃ.

এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার প্রাবন্ধিক লিখেন– 'হেরাক্লিয়াসের চরিত্র খুবই বিস্ময়কর। তার চরিত্র বুঝা সহজ নয়। ব্যক্তিগতভাবে সাহসী, বীর, বীর্যবান; রাজনৈতিকভাবে বিচক্ষণ, অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী এবং যোগ্য সিপাহসালার হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত শান্তচিত্তে নিজের চোখের সামনে নিজের সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হতে দেখেছেন নীরব দর্শকের মতো। তার জীবনের প্রতিটি ধাপ অপর ধাপের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন।

তার চিন্তা চরিত্রের বিচিত্র ধরন, রূপ ও যোগ্যতার বিভিন্ন মাত্রা শুধু একটি থেকে অপরটি আলাদাই নয় পরস্পর বিরোধীও। তবে আমাদেরকে এ কথা বিস্মৃত হলে চলবে না, তার পারিবারিক জীবন সম্পর্কে আমার ধারণা খুবই স্বল্প ও অপর্যাপ্ত। তার চরিত্রের এই পরস্পরবিরোধী রূপের হয়তো প্রকৃত কোনো কারণ থাকতে পারে।

যদিও তার কর্মকাণ্ডের জন্য সেটা যথার্থ কারণ বলা যায় না। তবে তার সুখ্যাতি বজায় থাকার জন্য তিনি যদি ইরানের সাথে সংঘটিত বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের পরপরই মারা যেতেন, সেটাই ভাল ছিলো।[১]

এ সকল ভাষ্য ও বর্ণনায় ইউরোপিয়ান সকল ঐতিহাসিকই স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছেন, ইরানের বিরুদ্ধে লড়াই করার সময় হেরাক্লিয়াসের মধ্যে তাৎক্ষণিক ও সাময়িক বিস্ময়কর বিপ্লবের সৃষ্টি হয়েছিলো। তার মধ্যে এমন এক প্রাণ জন্ম নিয়েছিলো, যা পরে তার মধ্যে বহাল থাকেনি। ইরানীদের কাছ থেকে যা কিছু অর্জন করেছিলো, অলসতা নির্জীবতা ও অবহেলা করে সেই অর্জন আবার আরবদের হাতে খুইয়েছে।

কিন্তু শেষ কথাটির আমাদের কাছে বিশেষ কোনো মূল্য নেই। এতে আমাদের কথা আছে। কথা আছে এ বিষয়ে হেরাক্লিয়াস ইসলামী হামলার পরিপূর্ণ প্রতিরোধ করেনি, না রোমকদের পতনের ক্ষেত্রে ইসলামের শক্তি মুসলমানদের চরিত্র বেশি কার্যকর ছিলো, নাকি হেরাক্লিয়াসের অযোগ্যতা, অমনোযোগিতা এবং খোদ রোম সাম্রাজ্যেরই দুর্বলতা? তবে এখানে এ বিষয়ে দীর্ঘ অনুসন্ধান আমাদের আলোচনার বিষয় নয়।

[১]. এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, ১১তম খণ্ড, ৬৮২ পৃ.

আল কুরআনের আরো কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী

রোমকদের বিজয় সংক্রান্ত কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী আমরা বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেছি। কুরআনুল কারীমে আরো অনেক ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। এখানে তার পরিপূর্ণ ফিরিস্তি উপস্থাপন আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা উপমাস্বরূপ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী তুলে ধরছি। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পরবর্তীকালের ইতিহাসসমূহে এর সবিস্তার ব্যাখ্যা দেখা যেতে পারে।

১. আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী অনুগত মুসলমানদের জন্য রাজত্ব লাভের ভবিষ্যদ্বাণী–

وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٥

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে শাসক বানাবেন, যেভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের শাসক বানিয়েছিলেন এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয় ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারা তো সত্যত্যাগী। *[নূর : ২৪ : ৫৫]*

২. মুহাজিরগণ ক্ষমতাসীন হবেন অতঃপর তাদের দীনি ও আখলাকী ফলাফল সম্পর্কে কুরআনে কারীম ভবিষ্যদ্বাণী–

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ٥ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ

النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ
فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ○

যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে, যারা আক্রান্ত হয়েছে। কারণ, তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম। তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এই কারণে যে, তারা বলে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। আল্লাহ যদি মানবজাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে পড়তো খৃষ্টান সংসারবিরাগীদের উপাসনালয় গির্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং সেই মসজিদসমূহ, যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন, যে তাঁকে সাহায্য করে। আল্লাহ নিশ্চয়ই শক্তিমান, পরাক্রমশালী।' *[হজ : ২২ : ৩৯ : ৪০]*

অতঃপর এদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে–

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ○

আমি এদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে এরা যথাযথভাবে নামায আদায় করবে, যাকাত দেবে, সৎকর্মের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কর্মে বাধাদান করবে। আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহরই এখতিয়ারে। *[হজ : ২২ : ৪১]*

৩. মুসলমানদের মধ্যে নতুন সম্প্রদায়ের আগমন ও তাদের অবদান সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী–

এ ব্যাপারে কুরআন মাজীদের ভবিষ্যদ্বাণী–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ
بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ
يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ○

হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্য থেকে কেউ দীন থেকে ফিরে গেলে নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায়কে আনয়ন করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসেন এবং যারা আল্লাহকে ভালোবাসবে; তারা মুমিনদের প্রতি কোমল ও কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না। *[মাইদা : ৫ : ৫৪]*

৪. আরব মুরতাদ ও রোম পারস্যের যুদ্ধ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী–

قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ
تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن
تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ○

যেসব মরুবাসী পশ্চাতে রয়ে গিয়েছিলো, তাদেরকে বলো অবিলম্বে তোমরা আহূত হবে এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে; তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে তারা আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত। তোমরা এই নির্দেশ পালন করলে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করবেন। আর তোমরা যদি পূর্বানুরূপ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো, তিনি তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন। *[ফাতহ : ৪৮ : ১৬]*

৫. ইসলামের বিজয় সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী–

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ
وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ○

তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর জ্যোতি নির্বাপিত করতে চায়। কাফের সম্প্রদায় অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ তাঁর জ্যোতির পূর্ণ উদ্ভাসন ব্যতীত অন্য কিছু চান না। *[তাওবা : ৯ : ৩২]*

আরো ইরশাদ করেন–

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ○

মুশরিকরা অপ্রীতিকর মনে করলেও অপর সকল দীনের উপর জয়যুক্ত করার জন্যই তিনি পথ নির্দেশ ও সত্য দীনসহ তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন। *[তাওবা : ৯ : ৩৩]*

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

তারা আল্লাহর নূরকে ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়; কিন্তু আল্লাহ তার নূরকে পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে। *[সফ : ৬১ : ৮]*

৬. কুরআনের সংরক্ষণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী–

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

নিশ্চয়ই এই (গ্রন্থ) নসীহত আমিই অবতীর্ণ করেছি আর আমিই এর সংরক্ষণকারী। *[হিজর : ১৫ : ৯]*

৭. কুরআন সংকলন, প্রচার ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী–

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۝

তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা তার সাথে সঞ্চালন করো না। এর সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমার। সুতরাং যখন আমি তা পাঠ করি, তুমি সেই পাঠের অনুসরণ করো; অতঃপর এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমার। *[কিয়ামাহ : ৭৫ : ১৬ : ১৯]*

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন–

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ এর অর্থ হলো, গ্রন্থাকারে কুরআন সংকলন করা আমার কর্তব্য।

قرانهএর অর্থ হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের মধ্যে কারী ও সাধারণ লোকদেরকে এ কিতাব তেলাওয়াত করার তাওফিক আমিই দান করবো। তাওফিক এজন্য দেবো, যাতে তেলাওয়াতে ধারাবহিকতা বিনষ্ট না হয়।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন– আপনি এ নিয়ে চিন্তা করবেন না কুরআন আপনার অন্তর থেকে হারিয়ে যাবে। এই ভেবে বারবার উচ্চারণ করার কষ্ট স্বীকার করারও প্রয়োজন নেই। এটাও একটা মু'জেযা সাধারণ মানুষকে যেমন কুরআন মুখস্থকরণ ও স্মরণ রাখার জন্য বারবার পড়তে হয়, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তেমনটি করতে হয়নি। কেবল হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর পঠনের মাধ্যমেই কুরআনের প্রতিটি বর্ণ বিন্দু তাঁর অন্তরে অংকিত হয়ে যেতো। কারণ, আল্লাহ তায়ালাই বলে দিয়েছেন– আপনার তাবলীগ ও প্রচারের অনেক পর যা হবার কথা, সেই ভার আমি আমার উপর নিয়ে নিয়েছি। অর্থাৎ কুরআন গ্রন্থাকারে সংকলন করা, উম্মতের সাধারণ অসাধারণ সকলেই তার তেলাওয়াত করা। তাই আপনার অন্তরকে কুরআন হৃদয়ঙ্গম করার জন্য কষ্ট দেবেন না। বরং হযরত জিবরাইল যখন আপনার সামনে এ কালাম তেলাওয়াত করবে, আপনি মনোযোগসহ শুধুই শুনবেন। অতঃপর এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দায়িত্বও আমার। এজন্য সকলকালেই একদল মানুষকে কুরআনের কঠিন শব্দাবলীর বিশদ ব্যাখ্যা ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী বর্ণনা করার যোগ্যতা দান করবো। তারা কুরআনের মর্ম ও বিধানাবলী তুলে ধরবে। আর এটাও কুরআন মুখস্থকরণ ও প্রচারকরণের পরেই হবে। কারণ, কুরআনের আয়াত একটি অপরটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ও সমর্থক। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন কুরআনের ব্যাখ্যাতা।

কুরআন সংরক্ষণের ওয়াদা এভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে মানুষ একে গ্রন্থাকারে সংকলন করেছে, কপি করেছে। পৃথিবীর পশ্চিম থেকে পূর্ব পর্যন্ত মানুষ এর তেলাওয়াত করছে। রাত দিন তেলাওয়াতের তাওফিক লাভে ধন্য হচ্ছে অগণিত উম্মত। উল্লিখিত বাক্যটির এটাই সারমর্ম। এখানে বলা হয়েছে, পানি এই কালামকে মিটাতে পারবে না। আয়াতে جمعه ও قرانه শব্দ দু'টি একসাথে উল্লেখ করার পর ثم বিরতিবোধক শব্দটির পর بيانه কথাটি উল্লেখ করার মর্ম হলো– কুরআন সংকলনের সময়ই তার পঠনের প্রতি মানুষের আকর্ষণ আকুল হয়ে উঠেছিলো। আর তার ব্যাখ্যা হয়েছে কার্যত আরো পরে।[১]

৮. হুদায়বিয়ার সন্ধি জয় ও মক্কা বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী–

আল্লাহ তায়ালা এই মর্মে ইরশাদ করেছেন–

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ۝

[১]. ইযালাতুল খাফা, ১ম খণ্ড, ৫০-৫১ পৃ. ১২৮৬ হি.

(হে মুহাম্মদ)! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি। *[ফাতহ : ৪৮ : ১]*

৯. ভবিষ্যৎ গনীমত ও বিজয় লাভ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী–

وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهِ o

আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যুদ্ধলভ্য বিপুল সম্পদের, যার অধিকারী তোমরাই হবে। তিনি এটা তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত করেছেন। *[ফাতহ : ৪৮ : ২০]*

وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا o

এবং আরো রয়েছে, যা এখনো তোমাদের অধিকারে আসেনি। তা আল্লাহ (নিজ) আয়ত্তে রেখেছেন। *[ফাতহ : ৪৮ : ২১]*

১০. মসজিদুল হারামে প্রবেশের ভবিষ্যদ্বাণী–

لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ o

আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই নিরাপদে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে। তোমাদের কেউ মস্তক মুণ্ডন করবে আবার কেউ কেশ কর্তন করবে। *[ফাতহ : ৪৮ : ২৭]*

১১. প্রিয়নবীর জীবন সায়াহ্নে ইসলাম প্রসারিত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী–

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا o

যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে দেখবে।

১২. প্রিয়নবীর শত্রুদের ব্যর্থতার ভবিষ্যদ্বাণী–

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

নিশ্চয়ই তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীরই নির্বংশ। *[কাওছার : ১০৮ : ৩]*

হেদায়াত ও ইনকিলাব : কুরআনের অনন্য ভূমিকা

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনে কারীম এবং স্বীয় নববী আখলাক ও জীবন-চরিতের (وَكَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآن আর তাঁর জীবন চরিতই ছিলো কুরআনের বাস্তব চিত্র) মাধ্যমে বিশ্বাসিক মানসিক আধ্যাত্মিক চারিত্রিক মনস্তাত্ত্বিক লেনদেন ও সামাজিক যে বিপ্লব ও ইনকিলাব সৃষ্টি করেছিলেন, মানব ও মানবতার পূর্ণ ইতিহাসে তার কোন উপমা নেই। আর এটিই কুরআনের এক অনন্য মু'জেযা। কুরআনের এই এক মু'জেযার ভেতরে রয়েছে আরো কত শত মু'জেযা। বরং এ এক মু'জেযার পূর্ণ আকর। এ বিপ্লবের পরশে ব্যক্তি গোষ্ঠী যেই এসেছে, তার জীবন ও ব্যক্তিত্ব এক স্বতন্ত্র মু'জেযায় রূপান্তরিত হয়েছে। মানবজাতির ইতিহাস ক্ষুদ্র কোন স্থান কিংবা অতীব ক্ষুদ্র কোন মানব কাফেলার মধ্যেও পূর্বে কোনদিন এতো গভীর শেকড়স্পর্শী ও এতটা বিস্তৃত বিপ্লব প্রত্যক্ষ করেনি।

এখানে অবশ্য ইসলাম ও জাহেলিয়াতের তুলনামূলক পর্যালোচনা করা একান্ত জরুরি। এ পূর্ণ বিপ্লবের বিভিন্ন দিক ও বৈশিষ্ট্য সেই সাথে উভয় কালের বুদ্ধি বিবেক ধর্ম মনস্তত্ত্ব চরিত্র ও সমাজচিন্তার ইতিহাসটাও উপস্থাপন করতে হবে। তবেই কুরআনের এ বিপ্লব মু'জেযার স্বরূপ উন্মোচন করা সম্ভব হবে। আর এর জন্য চাই ধারাবাহিক সিরিজগ্রন্থ প্রণয়ন। শুধুমাত্র এক দু'টি গ্রন্থেও এর কিনারা পাওয়া যাবে না। স্বয়ং কুরআন মাজীদ অতঃপর নির্ভরযোগ্য সীরাতগ্রন্থসমূহে ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত ইসলাম ও জাহেলিয়াতের বিপরীতমুখী ঘটনাগুলো একত্রিত করলেও বিষয়টা মোটামুটি অনুমান করা যাবে। কিছুটা হলেও বুঝা যাবে, কুরআন এক্ষেত্রে কি বিশাল ও গভীর বিপ্লব সাধন করেছে।

কুরআনের এ মু'জেযার একটি অলৌকিক দিক হলো, এই বহুমাত্রিক ব্যাপক বিস্তীর্ণ মু'জেযাটি বাস্তবে সাধিত হয়েছে ঐসব উপায় উপকরণ ব্যতীত, যেসব মাধ্যম ও উপকরণকে মানুষ জানে ও বুঝে এবং সাধারণত যেসব মাধ্যম ও উপকরণের উপর ভিত্তি করে মানবতার শিক্ষক ও সংস্কারকগণ তাদের বিপ্লবকে সফল করে তোলেন। তার কোনটিই ব্যবহৃত হয়নি কুরআনের এই অলৌকিক বিপ্লব সাধনে। যেমন, শিক্ষা প্রশিক্ষণ, প্রচার প্রসার, রচনা-সংকলন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণকেন্দ্র, প্রকাশনা সংস্থা, যাবতীয় প্রচার মাধ্যম কোনটিই ব্যবহার করেনি কুরআন। কুরআন নিজেই তার এই অলৌকিক দিকটির প্রতি

ইঙ্গিত করেছে কোথাও কোথাও। যারা এক সময় একে অপরের রক্তপিপাসু দুশমন ছিলো, তারাই পরে অকৃত্রিম প্রাণের বন্ধুত্বে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু বিস্ময়কর এই রূপান্তরের পেছনে কুরআন কোন বিশাল অংকের অর্থ খরচ করেনি, বিরাট কোন প্রজেক্ট পাতেনি।

هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

তিনিই তোমাকে স্বীয় সাহায্য ও মুমিনদের দ্বারা শক্তিশালী করেছেন এবং তিনি তাদের পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন। পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করলেও তুমি তাদের হৃদয়ে প্রীতি স্থাপন করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। *[আনফাল : ৮ : ৬২-৬৩]*

কোন কোন স্থানে কুরআনে কারীম এই ইনকিলাব ও বিপ্লবকে নিজের বলে দাবি করেছে। বলেছে, কুরআনের মাধ্যমেই এ মহান বিপ্লব সাধিত সম্পাদিত হয়েছে। দেখুন–

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝

তিনিই উম্মীদের মাঝে এমন একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদেরই মধ্য থেকে, যে তাদের নিকট তেলাওয়াত করে তার আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত। ইতোপূর্বে তো এরা ছিলো ঘোর বিভ্রান্তিতে। *[জুমু'আ : ৬২ : ২]*

আরও ইরশাদ করেন–

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۝

তিনিই তার বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেন তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোকে আনার জন্য। *[হাদীদ : ৫৭ : ৯]*

الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۝

আলিফ-লাম-রা। এই কিতাব, এটা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি মানবজাতিকে বের করে আনতে পারো অন্ধকার থেকে আলোকে। *[ইবরাহীম : ১৪ : ১]*

ইসলাম ও জাহেলিয়াত সম্পর্কে কুরআন অত্যন্ত শিল্পময় ভঙ্গিতে আলোকপাত করেছে। ইসলাম ও মূর্খতা উভয়কালের বিশাল পার্থক্য তুলে ধরেছে এভাবে–

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

এবং! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো। তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে। তোমরা তো অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ তা থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন। এভাবে আল্লাহ তোমাদের সামনে তার নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পারো। *[আলে ইমরান : ৩ : ১০৩]*

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ ۝

যে ব্যক্তি (আত্মিকভাবে) মৃত ছিলো, যাকে আমি পরে জীবিত করেছি এবং যাকে মানুষের মধ্যে চলার জন্য আলো দিয়েছি...। *[আনআম : ৬: ১২২]*

বাস্তবপক্ষে ইসলাম ও জাহেলিয়াতের এর চাইতে স্পষ্ট কোন চিত্র অংকন করা যায় না। ইসলাম ও মূর্খতার পার্থক্য ও ব্যবধানকে এর চাইতে অধিক পরিষ্কার ও আকর্ষণীয় করে উপস্থাপনও করা যায় না। মূলত ইসলাম ও মূর্খতার বিস্তীর্ণ ইতিহাস এই ক্ষুদ্র দুটো আয়াতেরই ব্যাখ্যা মাত্র। জাহেলিয়াত হলো كنتم اعداء

[তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে] আর كنتم على شفا حفرة من النار [তোমরা তো ছিলে অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে]-এর সমন্বিত চিত্র। এর বিপরীতে ইসলাম হলো الف بين قلوبكم [তিনি তোমাদের হৃদয়ে পরস্পর প্রীতির সঞ্চার করেছেন] আর انقذكم منها [আল্লাহ তোমাদেরকে সেই (অগ্নিকুণ্ড) থেকে রক্ষা করেছেন] এর বিশ্বস্ত ব্যাখ্যা ও দর্পণ।

কুরআন من كان ميتا (যে ব্যক্তি মৃত ছিলো) দ্বারা যে চিত্র এঁকেছে, মূর্খতার যুগের উন্নত থেকে উন্নততর কোনো ব্যক্তির এর চাইতে সুন্দর শুদ্ধ ও শিল্পিত পরিচয় আর হতে পারে না। আর ইসলামের ধারাবাহিক আলোকিত বিপ্লবের যদি ছবি আঁকতে হয়, তাহলেও فاحيينه وجعلنا له نورا يمشى به فى الناس (যাকে আমি পরে জীবিত করেছি এবং যাকে মানুষের মধ্যে চলার জন্য আলো দিয়েছি) এর চাইতে উত্তম কোনো ছবির চিত্রায়ণ ও শব্দায়ণ আর হতে পারে না।

ইতিহাস ও গবেষণার আলোকে কুরআন মাজীদ ও অতীতকালের আসমানী গ্রন্থসমূহ

কুরআনের পূর্বে অবতীর্ণ আসমানী কিতাবসমূহ নিয়তই পরিবর্তন ও বিকৃতির শিকার হয়েছে, শিকার হয়েছে ধ্বংস ও বিনাশের। কারণ, আল্লাহ তায়ালা ওসব আসমানী গ্রন্থ সংরক্ষণ ও টিকিয়ে রাখার ভার নেননি। বরং সেই ভার অর্পণ করেছিলেন সেকালের আলেম ও ধর্মবাহকের উপর। তাছাড়া ওসব আসমানী গ্রন্থ বিশেষ একটা কাল পর্যন্তই মানুষকে পথ দেখিয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ০

নিশ্চয়ই আমি তাওরাত অবতীর্ণ করছিলাম, যাতে পথনির্দেশ ও আলো ছিলো। নবীগণ যারা আল্লাহর অনুগত ছিলো ইহুদীদেরকে তদনুসারে বিধান দিতো। আরো বিধান দিতো রব্বানীগণ[১] এবং বিদ্বানগণ। কারণ, তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিলো এবং তারা ছিলো তার সাক্ষী। *[মাইদা : ৫: ৪৪]*

কুরআনের এই বক্তব্য ইতিহাস গবেষণা ও অনুসন্ধানের আলোকেও প্রমাণিত। যাদের কাছে ওসব আসমানী কিতাব এসেছে, স্বয়ং তারাও এ সত্য মেনে নিয়েছেন। ওল্ড টেস্টামেন্টের গ্রন্থগুলো বারবার ধ্বংস ও আগুনের শিকার হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে, পুড়েছে। স্বয়ং ইহুদী ঐতিহাসিকরাও একমত, এ জাতীয় ধ্বংস ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা অন্তত তিনবার ঘটেছে। প্রথমবার ব্যাবিলনের বাদশাহ বুখতেনসর (Nebuchadezzar) ৫৮ খৃষ্টপূর্ব ইহুদীদের উপর হামলা করে বাইতুল মুকাদ্দাসে অগ্নিসংযোগ করে। আর এই বাইতুল

[১]. রব্বানী অর্থ ইলাহ তথা মাবুদের সাধক। রব শব্দ থেকে উদগত রব্বানী, যার বিশেষ অর্থ আল্লাহর জ্ঞানে যে জ্ঞানী এবং তার বাস্তবায়নে যে বিশ্বাসী। আল্লাহর গুণবাচক রবগুণে গুণান্বিত হওয়ার দিকেও এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইফাবার আল কুরআনুল কারীমের টীকা অবলম্বনে। -অনুবাদক।

মোকাদ্দেসই হযরত সুলাইমান (আ.) তাওরাতের লিখিত কপি এবং হযরত মূসা ও হযরত হারুন (আ.)-এর 'তাবাররুকাত' সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন।

বুখতেনসরের এই আগুন এসব জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়। আর যেসব ইহুদী প্রাণে বেঁচে যায়, তাদেরকে বন্দী করে ব্যাবিলনে নিয়ে যায়। সেখানে তারা ৫০ বছর অবস্থান করে। আর আযরা অতীতের পাঁচটি সহীফাকে স্বীয় স্মৃতি থেকে পুনরায় লিপিবদ্ধ করান, যেগুলোকে তাওরাত বলা হয়। এতে তিনি ঘটনাগুলোকে ইতিহাসের মতো করে বিন্যস্ত করেন। তারপর 'নাহমিয়া' অন্যান্য কিতাবগুলো এর সাথে যুক্ত করেন এবং হযরত দাউদের (আ.) 'যাবুর'ও এর সাথে যুক্ত করে দেন।

দ্বিতীয়বার গ্রীক এনতাকিয়ার বাদশাহ চতুর্থ এনটিওখোস খৃষ্টপূর্ব ১৬৮ সালে বাইতুল মুকাদ্দাসের উপর আক্রমণ করে এবং মুকাদ্দাস সহীফাসমূহ পুড়িয়ে ফেলে। তাওরাতের পাঠ, ইহুদী আচার আচরণ, বৈশিষ্ট্য ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ড সরকারিভাবে নিষিদ্ধ করে দেয়। ইয়াহুদামাকাবী পুনরায় এসব সহীফা সংকলন করেন। আহদে আতীক তথা ওল্ড টেস্টোমেন্ট এর সহীফাসমূহের তৃতীয় দফা সংযোজন করেন।

তৃতীয়বার রোম সম্রাট টিটাস Titus খৃষ্টাব্দ ৭০ সালের ৭ সেপ্টেম্বর পুনরায় বাইতুল মুকাদ্দাসের উপর হামলা করে। হাইকেল সুলাইমানসহ পূর্ণ বাইতুল মুকাদ্দাস ধ্বংস করে ফেলে। মুকাদ্দাস সহীফা আসমানী ধর্মগ্রন্থগুলো বিজয়ের স্মরণিকা হিসেবে জব্দ করে রোমের রাজধানীতে নিয়ে যায়। সেখান থেকে ইহুদীদের নির্বাসিত করে শহরের উপকণ্ঠে অন্যান্য জাতির লোকদেরকে পুনর্বাসিত করে।

পয়গাম্বরগণের এসব আসমানী ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে, তার শুদ্ধতা, সংরক্ষণ ও আসল মোতাবেক কিনা এ বিষয়ে ইহুদীদের চিন্তা, মানদণ্ড ও সিদ্ধান্ত মুসলমানগণের তাদের ধর্মগ্রন্থ আল কুরআন সম্পর্কে পোষিত মত, চিন্তা ও মানদণ্ড থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। দুই শ্রেণীর চিন্তা ও মানদণ্ডে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। মুসলমানগণ কুরআন মাজীদের প্রতিটি বর্ণ বিন্দুকে আল্লাহর কালাম মনে করে, কুরআনের প্রতিটি শব্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বলে বিশ্বাস করে। বিশ্বাস করে, কুরআনের প্রতিটি বর্ণ-বিন্দু অবতরণকাল থেকে বর্তমান অবধি বহাল অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। পক্ষান্তরে ইহুদী সম্প্রদায় মনে করে, আসমানী গ্রন্থগুলো রদবদল ও হ্রাস-বৃদ্ধি হয়েছে বলে সেগুলো আসমানী কিতাব হতে পারবে না এমনটি নয়; বরং এসব রদবদল ও হ্রাসবৃদ্ধি সত্ত্বেও এগুলো আসমানী কিতাব। তাছাড়া তাদের দৃষ্টিতে এগুলোকে স্বয়ং 'নবীদের রচনা'

বলতেও কোনো আপত্তি নেই। আমরা নিম্নে কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরছি, যেগুলো থেকে ইহুদী সম্প্রদায়ের আকীদা বিশ্বাস, চিন্তাধারা, তাদের মুকাদ্দাস ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে তাদের চিন্তা-দর্শন ও মানসিকতা কিছুটা হলেও আঁচ করা যায়। ইহুদী পণ্ডিত-গবেষকদের সাধনার ফসল 'ইহুদী এনসাইক্লোপেডিয়া'তে আছে–

ইহুদী বর্ণনাসমূহ যদিও এ বিষয়ে অত্যন্ত জোর দিয়েছে, 'আহদনামা কাদীম' ওল্ড টেস্টামেন্ট তাদেরই রচনা, যাদের কথা এতে উল্লিখিত হয়েছে। আর এটা অসঙ্গত কিছুও নয়। তবে তারা এ কথা মানতে কোনো দ্বিধাবোধ করেন না, এর মধ্যে কোনো কোনো গ্রন্থে রদবদল এবং কিছু সংযোজনও হয়েছে।[১]

প্রাচীন ইহুদী বর্ণনা অনুযায়ী তাওরাতের প্রথম পাঁচটি 'কিতাব' [হযরত মূসা (আ.) সংক্রান্ত শেষের আট আয়াত ব্যতীত] হযরত মুসা (আ.)-এর রচনা। তবে এই গ্রন্থগুলোতে বিদ্যমান বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী বক্তব্য ও পরস্পর ভিন্নতাগুলোর প্রতি রাব্বি নিয়মিতই লক্ষ রাখতেন এবং স্বীয় সুন্দর কৌশল বলে তা শুদ্ধও করে দিতেন।[২]

স্পেনোজা (Spinoza) বলেন– ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রথম পাঁচটি কিতাব মূসা (আ.)-এর নয়– আযরার রচনা।[৩]

সর্বশেষ গবেষণা অকাট্যভাবে এটাই প্রমাণ করেছে, ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রথম পাঁচটি কিতাব কমপক্ষে ২৮টি উৎস থেকে সংগৃহীত ও চয়িত।[৪]

এ হলো ওল্ড টেস্টামেন্ট বা আহদে আতীক-এর দশা। আর ইনজিল চতুষ্টয় যাকে নিউ টেস্টামেন্ট বলা হয়– এর দশা আরো শোচনীয়। এর সংকলন ও সংকলক সম্পর্কিত তথ্যাবলী এতো জটিল, দুর্বোধ্য, সংশয় ও দ্বন্দ্বপীড়িত যে, তাদের আর হযরত ইসা (আ.)-এর মাঝে বিরাট ফারাক পাওয়া যায়। এই ফারাক ও ব্যবধানপ্রাচীর পার করা কোনো গবেষক কিংবা ঐতিহাসিকের পক্ষেই সম্ভব নয়।[৫] এ ইনজিলগুলো বিভিন্ন ধর্মীয় কাউন্সিলে, বিভিন্নকালে রীতিমতো

---

১. Jewish Encyclopedia London, Vellentines one Volume, p.93.

২. জেভিস এনসাইক্লোপেডিয়া ৯ম খণ্ড, ৫৮৯ পৃ.

৩. প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, ৫৯০ পৃ.

৪. প্রাগুক্ত

৫. ইংরেজী তাফসীরে মাজেদী থেকে সংগৃহীত। ইনজিল চতুষ্টয়ের সংকলকদের কর্মকাল, তাদের সংকলনের ধারাবাহিক সন-তারিখ নির্ধারণ, যেসব কিতাব থেকে এই ইনজিল চতুষ্টয় সংগৃহীত সেগুলোর পরস্পর তথ্য, সংঘাত ও বিরোধ সম্পর্কে জানতে হলে পড়ুন লন্ডন ইউনিভার্সিটির ইতিহাস ও ধর্ম বিষয়ক প্রফেসর ই. ও. জেমস এর মর্যাদাশীল গ্রন্থ 'তারীখে মাযাহিব', ১৯৫৬ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত, ১৭৮-১৮০পৃ.।

পরিবর্তন পরিবর্ধন ও সংস্কারের শিকার হয়েছে। তাছাড়া এসব গ্রন্থ আসমানী গ্রন্থ, ওহী ইলহামের উপর নির্ভরশীল না হয়ে বরং ইতিহাস, জীবনী, ঘটনাবলী ও বিভিন্ন কাহিনীনির্ভর বলে অনুমিত হয়। বিশেষ করে যেসব কাল ও ইতিহাসের পথ মাড়িয়ে এসেছে এই ইনজিলসমূহ, যিনি ওসব কাল ও ইতিহাস সম্পর্কে গভীর ধারণা রাখেন; তিনি খুব সহজেই এ সত্যের সাক্ষ্য দেবেন।

এসব ইনজিল গ্রন্থে মুসলমানদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের হাদীস ও সুনান গ্রন্থের সমপরিমাণ নির্ভরযোগ্যতার মাপেও উত্তীর্ণ নয়। বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ সিহাহ সিত্তার সাথে তো তুলনা করার প্রশ্নই উঠে না। কারণ, এসব গ্রন্থে সংকলকদের থেকে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত ধারাবাহিক মুসলমানদের সহীহ ও বিশুদ্ধ সনদ গ্রন্থিত হয়েছে প্রতিটি হাদীসের সঙ্গে। বিশুদ্ধ হাদীস তাকেই বলা হয়, যেটি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর পূর্ণ সতর্কতা সততাসহ মুত্তাসিল সনদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর সেই বর্ণনাকারী কিংবা বর্ণিত হাদীসটিও কোনোরূপ ত্রুটি ও দুর্বলতা (ইল্লত ও শুযূয) থেকে মুক্ত হতে হবে।[৮] পক্ষান্তরে ইনজিলসমূহের কোনোটিতেই সনদের কোনো প্রকারেরই ধার ধারা হয়নি। এর সংকলকদের পর্যন্ত ধারাবাহিক কোনো বর্ণনা সূত্র সনদ গ্রন্থিত হয়নি সেসব কিতাবে। সনদ বর্ণিত হয়নি সংকলকদের থেকে হযরত ঈসা (আ.) পর্যন্তও।

তাছাড়া আমাদের হাতে এখন যেসব গ্রন্থ রয়েছে, সেগুলো এখন আর ভাষায় সংরক্ষিত নেই, যে ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছিলো। যে ভাষায় হযরত ঈসা আ. ও তাঁর সম্প্রদায় কথা বলতেন, সে ভাষায় এখন ইনজিল নেই। বরং এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় বরাবর রূপান্তরিত হয়েছে। বিভিন্ন অনুবাদকের হাত হয়ে আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে এসব গ্রন্থ। তাই এগুলো এখন জীবনী ও ইতিহাস গ্রন্থ; ঘটনাবলী ও ওয়াজ সংকলন মাত্র। সম্মান রক্ষার্থে যদি আমরা এগুলোকে মুসলমান সমাজে প্রচলিত মৌলুদনামা জাতীয় গ্রন্থের সাথে তুলনা নাও করি, তাহলে বড়জোর চতুর্থ শ্রেণীর হাদীস গ্রন্থের সাথে তুলনা করতে পারি– যাতে বিশুদ্ধতা ও তাহকীকের উচ্চ কোনো মানমাত্রা রক্ষিত হয়নি। এসব তত্ত্ব ও বাস্তবতার বিচারে শুরুতেই এসব সহীফাকে কুরআন মাজীদের সাথে তুলনা করা একান্তই ভুল। বরং অজ্ঞতার পরিচায়ক। কারণ, তুলনা ও বিচার হয় একই মান ও শ্রেণীর বিষয়ের মধ্যে। আকাশ-পাতালের মাঝে তো কোনো তুলনা চলে না।

[৮]. এ বিষয়ে জানার জন্য উসূলে হাদীস ও হাদীসের পরিভাষা বিষয়ক গ্রন্থাবলী দেখা যেতে পারে। এ সংক্রান্ত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা প্রচুর।

নওমুসলিম এবং ফ্রান্সের প্রাচ্যবিদ গবেষক মুসিভ এ টিনডিন (Eatondien) এসব ইনজিলসমূহের পরিচয়, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইতিহাসগত মর্যাদা নির্ণয় করতে গিয়ে খুবই চমৎকার লিখেছেন–

আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসা (আ.)কে তার ও তার জাতির ভাষায় যে ইনজিল দান করেছিলেন, তা যে হারিয়ে গেছে; এতে কোনো সন্দেহ নেই। এখন তার কোনো নাম-গন্ধও নেই। হয়তো সেটা নিজেই ধ্বংস হয়ে গেছে অথবা ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে ইচ্ছাকৃতভাবে। আর এ কারণেই খৃষ্টানরা তার স্থলে চারটি সংকলনকে বরণ করে নিয়েছে, যার শুদ্ধতা ও ঐতিহাসিক ভিত্তি সন্দেহপূর্ণ। কারণ, এগুলো রক্ষিত হয়েছে গ্রীক ভাষায়। আর গ্রীক ভাষার হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রকৃত সেমিটিক ভাষার স্বভাবের সাথেও মোটেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ কারণেই ওসব গ্রীক ভাষার ইনজিলসমূহের সম্পর্ক স্বীয় অবতরণকারী প্রভুর সাথে ইহুদীদের তাওরাত আর মুসলমানদের কুরআনের সঙ্গে সম্পর্কের চেয়ে অনেক দুর্বল।[১]

অধিকন্তু বাইবেলের অভ্যন্তরীণ প্রমাণাদিও এর স্পষ্ট ঐতিহাসিক ভুল, স্ববিরোধিতাপূর্ণ তথ্যাবলী ও বিবেকবিরোধী অসম্ভব অনেক কিছুর প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। যেমন, এতে আল্লাহ তায়ালার মর্যাদা ও পরিপূর্ণ গুণাবলী বিরোধী অনেক কথাই আল্লাহর সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে। তাছাড়া আসমানী ধর্মসমূহের সর্বসম্মত মতও ওসব তথ্যকে সমর্থন করে না। সমর্থন করে না সুস্থ কোন বিবেকও। এসব গ্রন্থে আম্বিয়া (আ.)-এর প্রতি এমনসব অপরাধ ও অভিযোগ আরোপ করা হয়েছে, যা কোনো সাধারণ সুস্থ মানুষও করতে পারে না। তাছাড়া তাওরাত ও ইনজিলে (যাকে একসাথে বাইবেল কিংবা কিতাবে মুকাদ্দাস[২] বলা হয়।) এমন অনেক তথ্য আছে, যা থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, এতে সংযোজন পরিবর্ধন ও বিকৃতি সাধন হয়েছে।

এই হলো সেসব ধর্মগ্রন্থের দশা, যেগুলো হাজার হাজার বছর ধরে তার অনুসারীরা বুকে ধারণ করে আসছে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে। আর পৃথিবীর দু'টি

[১]. আযওয়াউন 'আলাল মাসীহিয়্যাহ', ৫২-৫৩ পৃ.
[২]. এ বিষয়ে লিখিত এক অনন্য গ্রন্থ মক্কায় সমাধিস্থ (১৩০৮ হি.) মাওলানা রহমতুল্লাহ কিরানবী (রহ.)-এর অমর রচনা 'ইযহারুল হক'। লেখক এই গ্রন্থে কিতাবে মুকাদ্দাসের ১২২টি শাব্দিক বৈপরীত্ব চিহ্নিত করেছেন। আর ১০৮টি এমন ভুল চিহ্নিত করেছেন, যার কোন সুস্থ ব্যাখ্যা করা যায় না। মূল গ্রন্থ আরবী ভাষায় লিখিত। আমাদের সম্মানিত সুহৃদ মাওলানা তকী উসমানী এর অনুবাদ করিয়েছেন এবং শুরুতে অত্যন্ত মর্যাদাশীল একটি ভূমিকা লিখেছেন। এটি 'বাইবেল ছে কুরআন তক' শিরোনামে তিন ভলিয়মে পাকিস্তান করাচী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বাইবেল সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে এই গ্রন্থটি পড়া যেতে পারে।

বিদ্বান ও সংস্কৃতিগোষ্ঠী (ইহুদী-খৃষ্টান) হলো তার অনুসারী ও পতাকাবাহী। আর মুসলমানগণও তাদের এতোটুকু স্বীকার করেছে যে, তাদেরকে তারা 'আহলে কিতাব' উপাধিতে ভূষিত করেছে।

ভারতের 'বেদ' আর ইরানের 'উসতা'র অবস্থা আরো জটিল। এর কাল এতো প্রাচীন এ সম্পর্কিত ঐতিহাসিক তথ্যাবলী এতো কম, এগুলোর পথ ধরে প্রকৃত সত্য পর্যন্ত পৌঁছা এক দুঃসাধ্য বিষয়। আর এগুলো ঐতিহাসিক এমন অনেক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে, এর বিশুদ্ধতা এখন জটিল সন্দেহ ও সংশয়ে আকীর্ণ। এর নির্দিষ্ট কাল চিহ্নিত করা অসম্ভব। বেদ ও উসতা সম্পর্কে কিছু বলাই দুরূহ ব্যাপার।

The Socity Asiatique of Paris এর সদস্য এ বার্থ A. Barth তদীয় গ্রন্থ 'ভারতীয় ধর্মসমূহ' (The Religions of India)তে লিখেছেন–

'আমরা যদি কিছু সংযুক্ত তথ্যকে আলাদা করে নেই, যেগুলো পর্যালোচনা ও নিরীক্ষার মাধ্যমে আলাদা করা কঠিন কিছু নয়; তাহলে সামগ্রিক বিচারে এর মধ্যে শুধু মূল ভাষ্যই অবশিষ্ট থাকবে। আর দাবিও এতটুকুই করা যায়। অর্থাৎ, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন দাবিও নেই আর কৃত্রিমভাবে সে তার বয়সকেও গোপন করে রাখে না। এর মুল পাঠ্যাংশে বারবার সংযোজন ও বিকৃতি সাধন করা হয়েছে। অবশ্য সৎ উদ্দেশ্যেই এসব করা হয়েছে। তারপরও এসব গ্রন্থের সঠিক বয়স নির্ধারণ করা মুশকিল অসাধ্য। এর মধ্যে ব্রাহ্মণীয় অংশটি সবার পরে লিখিত হয়েছে। আর সেটা আমাদের কালের সূচনার পাঁচশ' বছরের অধিককাল পুরাতন নয়। বেদসমূহের অবশিষ্ট তথ্যাবলী আরো প্রাচীন। এতো প্রাচীন যে, সুনির্দিষ্টভাবে এ সম্পর্কে কিছু বলা যায় না। আর তার চাইতেও প্রাচীন যেগুলো, সেগুলো সম্পর্কে তো কিছু লেখা একেবারেই অসম্ভব। স্বয়ং ভারতীয় হিন্দু পণ্ডিত, গবেষক ও মনীষীগণ তাদের ধর্মগ্রন্থগুলো সম্পর্কে কী মত পোষণ করেন, তাদেরকে মুক্ত অনুসন্ধান ও লাগামহীন গবেষণা কোথায় পৌঁছে দিয়েছে, তা নিম্নের দুটি উদ্ধৃতি থেকেই অনুমিত হয়।

বিখ্যাত হিন্দু গবেষক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী তদীয় বিখ্যাত গ্রন্থ Philosophy of the Upanishads এ লিখেন–

এ সম্পর্কে দুটি ভিন্ন দর্শন উপস্থাপিত হয়েছে। তার একটির প্রতিনিধিত্ব করেছেন বলগঙ্গাধর তিলক। অপরটির ধারক ম্যাক্স মুলার (Max Mullar) তিলক মনে করেন– বেদসমূহে বর্ণিত 'প্রার্থনাগুলো' খৃষ্টপূর্ব ৪৫০০ বছর পূর্বে অস্তিত্ব লাভ করেছে। অথচ মুলারের মতে ঋগবেদ খৃষ্টপূর্ব ২২০০ বছরের আগে

রচিত হয়নি। অথচ তিনি এ বিষয়ে একমত, ঋগবেদই আর্য সম্প্রদায়ের চিন্তা ও দর্শনের প্রাচীনতম দস্তাবেজ। ... ঋগবেদ-এর বয়স নির্ধারণ না করে এ কথা পূর্ণ আস্থার সাথেই বলা যায়, যদিও তাঁর প্রার্থনাগুলো এই সংকলনে বিন্যস্ত ও গ্রন্থিত করে দেয়া হয়েছে; কিন্তু তার বিভিন্ন অংশ একই সময়ে রচিত হয়নি। আর এ কারণেই এর রচনাকাল চিহ্নিত করে তার বয়স উদ্ধার করা সম্ভব নয়। তবে এ কথা মানতে হবে, ঋগবেদ-এর সবগুলো প্রার্থনা কয়েক শতাব্দী ধরে রচিত হয়েছে।[১]

বেদসমূহের মৌলিক চিন্তা দর্শনের ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে ভারতীয় বিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব পণ্ডিতপুরুষ ডক্টর রাধাকৃষ্ণ (ভারতের সাবেক প্রেসিডেন্ট) তদীয় বিখ্যাত রচনা Indian Philosophyতে (২য় খণ্ড) লিখেন–

বেদসমূহের চিন্তা-দর্শন নির্দিষ্টও নয় আবার স্পষ্টও নয়। ফলে বিভিন্ন চিন্তাধারার লোকজন এগুলোকে বিভিন্নভাবে কাজে লাগাতে পারেন। তাছাড়া বেদগ্রন্থগুলোতে সরাসরি এই অবকাশও আছে। লেখকগণ পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে নিজস্ব বিশ্বাসমাফিক স্বীয় উদ্দেশ্য অনুযায়ী তার থেকে সনদ গ্রহণ করতে পারে।[২]

আর ইরানীদের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ উসতা– পারসিকরা যাকে পবিত্র আসমানী গ্রন্থ বলে বিশ্বাস করে– সম্পর্কে এক পশ্চিমা গবেষকের সাক্ষ্য তুলে ধরছি। যিনি এ বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করছেন, তিনি হচ্ছেন হারওয়ার্ড ইউনিভার্সিটির সেমিটিক ভাষা বিভাগের (Department of Semitic Languages) সাবেক চেয়ারম্যান। নাম Robert H. pfeiffer জনাব রবার্ট এনসাইক্লোপেডিয়া অফ রেলিজনের প্রবন্ধে লিখেন– উসতা (বর্ণনামতে) সকল জ্ঞানের আকর ছিলো। এর অধিকাংশটা সেকান্দর ধ্বংস করে দিয়েছে। তারপর যা কিছু রক্ষা পেয়েছিলো, তার ২১ ভাগ কিংবা নেসক (Nask) সম্বলিত একটি গ্রন্থ খৃষ্টাব্দ তৃতীয় শতাব্দীতে সংকলিত হয়। কিংবা তন্মধ্য থেকে একটিমাত্র ভাগ বা নেসক, যার নাম 'ভেনদীদাদ' (Vendidad) এটাই পরিপূর্ণরূপে রক্ষা পায়। খৃষ্টাব্দ নবম শতাব্দীর পর শুধু এবাদত সংক্রান্ত কিছু অংশ ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়, যা এখন সেখানে পাঁচ ভাগে পাওয়া যায়। এই পাঁচটি ভাগের নাম– ১. Yasna– ইয়াসনা, ২. Gatha– গাথা, ৩. Vespered– ভেসপার্ড ৪. Vendid– ভেনদীদ ও ৫. Khordaavasta– খোরদ উসতা।

---

[১]. কলকাতা থেকে ১৯৩৫ ঈ. সালে প্রকাশিত, ২৪-২৬ পৃ.

[২]. ১৯২৭ ঈ. সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত, ২১–২২ পৃ.

আল কুরআন মাজীদ হলো আল্লাহ তায়ালার সর্বশেষ কিতাব। এটি পূর্ববর্তী সকল কিতাবের সত্যায়নকারী ও পৃষ্ঠপোষক। মানবজাতির হেদায়াত ও সফলতা এরই উপর নির্ভরশীল। আল্লাহর সাথে বান্দার পরিচয় ও সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার একমাত্র সেতুবন্ধন এ কুরআন। কেয়ামত পর্যন্ত এই কুরআনই মানবজাতিকে আল্লাহর পথে আহ্বান করার দায়িত্ব পালন করবে অবিরামভাবে। তাই এর মর্যাদা সকল আসমানী গ্রন্থের উর্ধ্বে। বরং অনুপম এই বিস্ময়কর কালাম। এর সংরক্ষণ, সকল প্রকার হ্রাস বৃদ্ধি পরিবর্তন ও বিকৃতি থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছেন স্বয়ং তিনিই। ইরশাদ হয়েছে–

وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ
تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ০

বরং এটা অবশ্যই এক মহিমাময় গ্রন্থ– কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না, অগ্র থেকেও না, পশ্চাৎ থেকেও না। এটা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। *[হা-মীম আস সাজদা : ৪১ : ৪১-৪২]*

অনুরূপভাবে বিকৃতি সাধন, রদবদল, বিস্মৃতির শিকার, অন্তঃকরণ থেকে নিশ্চিহ্ন হওয়া কিংবা কোনরূপ দুর্ঘটনায় পড়ে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাওয়া থেকে তিনিই রক্ষা করেছেন মহান এই গ্রন্থকে। তাওরাত যেমন বারবার বিকৃতি ও ধ্বংসের কবলে পড়েছে, কুরআন কোনকালেই এ ধরনের কোন অঘটনের শিকার হয়নি। এই কারণেই আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ০

নিশ্চয়ই কুরআন আমিই অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক। *[হিজর : ১৫ : ৯]*

সংরক্ষণের এই অঙ্গীকারে এর সুরক্ষা, সংরক্ষণ, মুখস্থকরণ, প্রচার প্রসার, তেলাওয়াত, পাঠদান সবকিছুই রয়েছে। উপেক্ষার শিকার হওয়া, অস্বীকৃত ও অকার্যকর হওয়া, অবোধগম্য ও অবহেলায় পড়ে বিস্মৃত হওয়া থেকে রক্ষা করার কথাও বিধৃত হয়েছে ক্ষুদ্র এই অঙ্গীকারের মধ্যে। কুরআনের এই 'লাহাফিযূন' কথাটি অতীব ব্যাপক ও গভীর অর্থবোধক।

যখন আল্লাহ তায়ালা এই মর্মে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, মহান এই গ্রন্থকে তার প্রকৃত রূপে, তার সাথে সম্পৃক্ত সমুদয় বিষয়সহ [যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে ঠিক সেভাবে] হেফাযত ও

সংরক্ষণ করবেন, তখন তিনি মানুষের মন, কামনা, আন্তরিক আকর্ষণসহ প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন যথাযথভাবে। তিনিই এ বস্তু জগতকে মহান এই ফয়সালা ও লক্ষ্য সাধনে নিবেদিত করে দিয়েছেন। এ কারণেই যখনই কুরআনের কোন আয়াত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে উচ্চারিত হয়েছে, কর্ণকুহরে গুঞ্জরিত হয়েছে তার সুমধুর ধ্বনি, মুসলমানগণ মথিত আসক্তের মতো হৃদয় প্রাণ সামর্থ ঢেলে দিয়েছে তা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য। হৃদয়ে অংকিত করে নিয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে। হৃদয়ে রক্ষিত কুরআনের প্রতি কুদরতি প্রেমও উদ্বুদ্ধ করেছিলো তাদেরকে কল্যাণকর এই প্রতিযোগিতায়। তাছাড়া কুরআনে কারীমের অলৌকিকতা, সাহিত্যের অপরূপ শিল্পচ্ছটা, কুরআনের শব্দাবলীর কোমল রূপ উচ্চারণের মধুময়তা অধিকন্তু এর তেলাওয়াতকারী ও মহান বাহকদের সম্পর্কে বর্ণিত কুরআনের আয়াত ও অসংখ্য হাদীসের বাণী তাদেরকে করেছিলো আরো আশেক[১], আরো নিবেদিত। এখানেই শেষ নয়, মুসলমানদের এবাদত-বন্দেগী, আইন-বিধান, সভ্যতা সংস্কৃতি, জ্ঞান-সাহিত্য সবকিছুরই উৎস এই কুরআন। ফলে কুরআনের সাথে মুসলমানদের হৃদয়ের বন্ধন সৃষ্টি হয়েছে। সেই সম্পর্ক রূপান্তরিত হয়েছে প্রেমে। ফলে ইসলামের প্রভাতলগ্নেই মহান এই কালাম মুখস্থ করার বিস্ময়কর প্রাচুর্যপূর্ণ ইতিহাসের সৃষ্টি হয়েছে।

ঐতিহাসিক বি'রে মাউনার[২] ঘটনাটি সংঘটিত হয় হিজরী তৃতীয় সালে। এই যুদ্ধে এমন সত্তরজন সাহাবী শাতাদাতবরণ করেন, যারা সকলেই ছিলেন কুরআনের হাফেজ ও আলেম। এভাবে ক্রমাগত হাফেজে কুরআনের সংখ্যা মুসলমান সমাজে বেড়েই চলেছে অদ্যাবধি। বিস্ময়কর এই ধারা মুসলমানদের ছোট-বড় গ্রাম শহর সর্বত্রই এখন বিদ্যমান। কুরআন মুসলমানদের এক মুখ থেকে অন্য মুখে এক বক্ষ থেকে অন্য বক্ষে প্রতিনিয়ত স্থানান্তরিত হচ্ছেই। প্রবাহমান স্রোতস্বিনীর মতো প্লাবিত করছে হৃদয়ের পর হৃদয়। আর সেই হেফজ ও মুখস্থকরণে অর্জিত দক্ষতা, পক্বতা, বিশুদ্ধতা অতঃপর এবাদত বন্দেগীতে তার প্রাণোৎসারিত তেলাওয়াত এমন এক বিস্ময়কর জীবন্ত বাস্তবতা, যা কোন অমুসলমানের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। হ্যাঁ কোনো অমুসলমান যদি কোনো মুসলমান জনবসতিতে বসবাস করে, মুসলমান সমাজ ও পরিবেশের

---

[১]. এ বিষয়ে শাইখুল হাদীস যাকারিয়া (রহ.) সংকলিত 'ফাযায়েলে কুরআন' গ্রন্থটি বিশেষভাবে পড়া যেতে পারে। আমাদের দেশে এটি ফাযায়েলে আমলেরও অন্তর্ভুক্ত এবং সর্বত্র পাওয়া যায়। -অনুবাদক)

[২]. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, ৭১ পৃ. বি'রে মাউনা সম্পর্কিত হাদীসগুলো ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমসহ সুনান গ্রন্থসমূহের সংকলকগণও যত্নের সাথে তাদের গ্রন্থাবলীতে উল্লেখ করেছেন।

সাথে যার পরিচয় ও মেলামেশা আছে, তার পক্ষে হয়তো কিছুটা অনুমান করা সম্ভব। হাফেজে কুরআনের এই সংখ্যা সর্বকালেই ছিলো অসংখ্য। আর এখন তো লাখ লাখ। লিল্লাহিশ শুকর।

আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যথার্থ উত্তরাধিকারী ও মুসলমানদের কর্মকাণ্ডের দায়িত্বশীল প্রতিনিধিদের দৃষ্টিকে কুদরতীভাবেই এদিকে নিবদ্ধ করে দেন। ইয়ামামার যুদ্ধে বিপুল সংখ্যক হাফেজে কুরআন শহীদ হওয়ায় তারা শংকিত হোন। যদি এভাবে কুরআনের হাফেজগণ শহীদ হতে থাকেন আর কুরআন সংরক্ষণের একমাত্র ভিত্তি যদি হয় মানুষের স্মৃতি, তাহলে এর সংরক্ষণ আশংকার মুখোমুখি হতে পারে। এ কথা সর্বপ্রথম হযরত উমর ফারুক (রা.) ভাবেন। আর মুসলমানের কল্যাণ চিন্তায় তিনি সর্বদাই সবার আগে থাকতেন। তাঁর হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শরীয়তের লক্ষ্যমাত্রার অনুকূলে আবর্তিত হতো।

তিনি তাঁর মনের এই শংকার কথা আমীরুল মুমিনীন হযরত আবু বকরকে বললেন। পরামর্শ দিলেন কুরআনে কারীমকে লিপিবদ্ধ করে একত্রে সংকলন করতে। কারণ, কুরআন এ পর্যন্ত চামড়ার টুকরো, খেজুরের ডাল ও সাদা পাথরে লিখিত ছিলো। আর সংরক্ষিত ছিলো মানুষের বক্ষে স্মৃতির স্বচ্ছ পাতায়। আল্লাহ তায়ালা এ কাজের প্রয়োজন ও যৌক্তিকতা হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছেও উদ্ভাসিত করেছেন।

তিনি এ কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেন বিখ্যাত সাহাবী হযরত জায়েদ ইবন সাবিত (রা.)-এর উপর। তিনি পূর্ণ যত্ন, গুরুত্ব ও মনোযোগসহ এই দায়িত্ব পালন করেন। হাফেজগণের বক্ষ, কাতিবীনে ওহীর লিখিত সংরক্ষিত কপি ও নানা ধরনের টুকরো লিপিকা থেকে সংকলন করেন পবিত্র কুরআন। এভাবেই পূর্ণ সংকলন ও গ্রন্থরূপ ধারণ করে কুরআন মাজীদ। প্রস্তুতকৃত এই কপিই পরে সকলের কেন্দ্রীয় ভরসাস্থল রূপে বিবেচিত হতে থাকে।

তারপর তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.)-এর শাসনামল এলো। চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো বিজয়ের সুবাতাস। কুরআনের হাফেজগণও ছড়িয়ে পড়লেন চারদিকে। কুরআনের ক্বারীগণও ছড়িয়ে পড়লেন বিশাল মুসলিম জাহান জুড়ে। আর মুসলিমগণ আগত হাফেজ ও ক্বারীদের পঠন পদ্ধতি মোতাবেক কুরআনকে লুফে নিতে লাগলো তৃষ্ণার্ত চাতকের মতো। এতে কুরআনের প্রচারের সাথে সাথে বিভিন্ন পঠননীতি সমভাবে ছড়াতে লাগলো। এছাড়া বিপুল পরিমাণে অনারব ইসলামের আলোকিত শামিয়ানার নিচে আশ্রিত হতে লাগলেন। তারাও ভিড় করতে লাগলেন কুরআনের প্রাঙ্গণে। এতে অনারবদের বাচনভঙ্গী উচ্চারণ

বৈচিত্র্য যুক্ত হতে লাগলো কুরআনের পঠন উচ্চারণে। তখন সাহাবায়ে কেরাম (রা.) শংকিত হলেন এতে আবার কুরআনের মধ্যে কোনোরূপ বিকৃতি ঢুকে পড়ে কিনা। তখন হযরত উসমান (রা.) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর কালে সংকলিত কপিগুলো একত্রিত করে সেগুলো অবলম্বন করে 'মুতাওয়াতির' পঠনরীতি অনুযায়ী নতুন করে কপি তৈরি করার নির্দেশ দেন। নির্দেশ মাফিক তৈরিকৃত কপিগুলো প্রতিটি মুসলিম অঞ্চলে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। আর পাক মদীনায় একটি কপি সংরক্ষণ করেন, যার নাম ছিলো 'আল ইমাম'। হযরত উসমান (রা.)-এর আমলে তৈরিকৃত এই কপিগুলোই পূর্ব পশ্চিমব্যাপী পৃথিবীর সকল মুসলমান গ্রহণ করে নেন। যুগের পর যুগ বংশের পর বংশ ধরে উম্মাহর প্রতিটি সচেতন সদস্য অভ্যস্ত হয়ে উঠেন এই পঠন– তেলাওয়াতে। তারা মুখর হোন কুরআনের হেফজে। তারা কণ্ঠস্থ করেন পাক কালাম। নামাযে বন্দেগীতে আলোড়িত হন এই কালামের তেলাওয়াতে।

আজো পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সকল মুসলমান হযরত উসমান (রা.) কর্তৃক সংকলিত কপির উপর একমত। হিজরী ২৫ সালে যখন এই কপি তৈরি হয়েছে, তখন থেকে আজ অবধি মুসলমান সমাজে কেউ কোনোদিন এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেনি। আজ পর্যন্ত প্রত্নতাত্ত্বিক কোনো জাদুঘরে এর ব্যতিক্রম কোনো কপি কোথাও আবিষ্কৃত হয়নি।[১]

সংকলিত হবার পর থেকে আজ অবধি পৃথিবীর সমগ্র মুসলমান কুরআনের এই সংকলনের উপর, এর শুদ্ধতা ও যথার্থতার উপর একমত। আর এখন তো আলেম ও হাফেজদের এই বিশাল সংখ্যা, মুসলমানদের মাঝে এর বিপুল প্রচার ও প্রসারকে অতিক্রম করে মনমতো এর কোনো বিকৃতি সাধন একেবারে অসম্ভব ব্যাপার।

এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকায় এই স্বীকারোক্তি স্পষ্টভাবে লিখিত আছে–

'এ পৃথিবীতে সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ কুরআন।'[২]

---

১. মিস্টার এ. মাঙ্গানা (ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটির ভূতপূর্ব অধ্যাপক) লিখেন: ইউরোপের লাইব্রেরীগুলোতে কুরআনের হাতের লেখা অনেক কপি আছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন কপিটি তৈরি হয়েছে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে। কিন্তু এগুলোর মধ্যে শব্দগত কোনো পার্থক্য নেই তবে হস্তলিপির ধরনগত কিছুটা ব্যতিক্রম আছে। আর এর কারণ আরবী ভাষার প্রাচীন হস্তলিপির দুর্বলতা। একই ধরনের মন্তব্য করেছেন নলডেক (NOEL DEKE) এনসাইক্লোপেডিয়া অব রিলিজন (১ম খণ্ড, ৫৪৮–৫৪৯) এর প্রবন্ধে।

২. এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' শিরোনাম দ্রষ্টব্য।

প্রাচ্যবিদ ও ইউরোপিয়ান গবেষক-শ্রেণী যারা কুরআনকে ওহীর মাধ্যমে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ বলে বিশ্বাস করে না- উল্লিখিত মতের সাথে একমত। আমরা এ সুবাদে এখানে কয়েকজন খৃষ্টান গবেষকের মতামত তুলে ধরছি। ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে একপেশে আচরণের কারণে খুবই বিখ্যাত স্যার উইলিয়াম মুয়র। যার লেখা 'লাইফ অফ মুহাম্মদ'-এর জবাবে ভারতীয় মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষার পতাকাবাহী, আলীগড় ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমদ খানকে 'খুতুবাতে আহমাদিয়াহ' রচনা করতে হয়েছিলো। সেই স্যার উইলিয়াম তার উল্লিখিত গ্রন্থে লিখেন-

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাত লাভ করার মাত্র সিকি শতাব্দীর মধ্যেই চরম বিরোধ ও দলাদলির সৃষ্টি হয়, যার পরিণতিতে হযরত উসমান (রা.) শহীদ হন। আর এই বিরোধ এখনও বহাল আছে। কিন্তু এসব দলের কুরআন একটাই। সকল কালে ব্যাপকভাবে সর্বদলে একই কুরআন পঠিত হওয়া অত্যন্ত শক্তভাবে এ কথাই প্রমাণ করে, এখন আমাদের সামনে সেই গ্রন্থটিই উপস্থিত, যা এই দুর্ভাগা[৩] খলীফার নির্দেশে সংকলিত হয়েছিলো। হয়তো পৃথিবীতে দ্বিতীয় আরেকটি এমন গ্রন্থ নেই, যার মধ্যে সুদীর্ঘ বার শতাব্দী পর্যন্ত শব্দগত কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি। কুরআনের পঠন রীতিতে (কিরাআত) যে মতভিন্নতা আছে, তাও বিস্ময়কর রকম স্বল্প। আর এর উৎসও তার ই'রাব, যা পরবর্তীকালে লাগানো হয়েছে।[৪]

Wherry তদীয় তাফসীর গ্রন্থে লিখেন-

'সমগ্র সহীফার মধ্যে একমাত্র কুরআন সর্বাধিক সংরক্ষিত ও খাঁটি।'[৫]

কুরআনে কারীমের বিখ্যাত অনুবাদক palmer লিখেন-

হযরত উসমান (রা.) কর্তৃক সংকলিত কুরআনের মূল পাঠ সেকাল থেকে বর্তমান অবধি সর্বজনস্বীকৃত ও গৃহীত আসমানী গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।[৬]

Lanpoole লিখেন-

---

৩. আসল মুতাবিক নকল।
৪. Sir willian Muir, Life of Mohammed (1912)
৫. Conmantary on the Quran, ১ম খণ্ড, ২৪৯ পৃ.।
৬. The Quran Introduction p.79.

কুরআনের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য হলো, তার প্রকৃত রূপ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। এর প্রতিটি বর্ণ, যা আমরা এখন পাঠ করি, তার উপর আমরা এতটুকু বিশ্বাস ও ভরসা করতে পারি, তা প্রায় তেরশ' বছর যাবত অপরিবর্তিতই আছে।[১]

মূলত এই সত্য ও বাস্তবতার কারণেই ইসলামে আর কোন নবীর প্রয়োজন নেই। কারণ, কুরআনে এমন কোন সন্দেহ সৃষ্টি হয়নি, যা তিনি দূর করবেন; আলো-আঁধারের এমন কোন সংমিশ্রণ ঘটেনি, যা তিনি এসে পার্থক্য বিধান করবেন; কোন মিথ্যা কিংবা ধোঁকার পর্দাও পড়েনি, যা তিনি দীর্ণ করে সত্য বিকাশে সাহায্য করবেন। তাছাড়া মুসলমানদের আজ এমন কোন কিতাবেরও প্রয়োজন নেই, যে কিতাব রহিত কিতাবের স্থলাভিষিক্ত হবে এবং সেই কিতাবের প্রতিনিধিত্ব করবে, যা রদবদল কিংবা বিকৃতির শিকার হয়েছে।[২]

---

১. উদ্ধৃতিগুলো মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদীর সুবিখ্যাত ইংরেজী তাফসীর থেকে সংগৃহিত হয়েছে।
২. লেখকের 'মানসাবে নবুওত'গ্রন্থ থেকে চয়িত, (২২৭-২৪৩) পৃ.

কুরআনে কারীম দ্বারা উপকৃত হওয়ার শর্তাবলী ও প্রতিবন্ধক বিষয়সমূহ

কুরআনের সম্বোধিত এই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই। প্রতিটি মানুষকে সম্বোধন করেই বিবৃত হয়েছে এর প্রতিটি বক্তব্য। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল যোগ্যতাগত ব্যবধান, তৃষ্ণা ও পানির প্রতি আগ্রহী হওয়ার বিভিন্নতা, অতঃপর প্রার্থিত পানি দ্বারা উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে সকল মাটি এক ও অভিন্ন বলে বিবেচিত হয় না। হয় পরস্পর স্বতন্ত্র। যেভাবে উন্নত থেকে উন্নততর খাবার পাকস্থলীর বিভিন্নতার কারণে একেক উদরে একেক ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করে, একেক পেটে দেখা দেয় একেক রকমের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, ঠিক তেমনিভাবে কুরআন প্রতিটি মানুষকে সমভাবে সম্বোধন করেছে। তবে সেটাকে গ্রহণ করা ও তার দ্বারা উপকৃত হওয়ার সামর্থ তো আর সবার সমান নয়। বিষয় একটাই। কিন্তু মানুষের পাত্র ও সামর্থ ভিন্ন ভিন্ন। কুরআনের প্রভাব ও ফলাফলগত এই পার্থক্য আল্লাহ তায়ালাই তুলে ধরেছেন কুরআনে কারীমে এবং বিপরীতমুখী ফলাফলের দুটি চিত্র পাশাপাশি তুলে ধরেছেন–

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۝

আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যা মুমিনদের জন্য নিরাময় ও রহমত। কিন্তু তা জালেমদের শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। *[বনি ইসরাঈল : ১৭ : ৮২]*

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ۝

তুমি বলে দাও, এটা ঈমানদারদের জন্য হেদায়াত ও শিক্ষা। আর যারা ঈমান আনে না, তাদের কর্ণকুহরে রয়েছে বধিরতা। আর এটাই তাদের অন্ধত্ব ও গোমরাহীর কারণ। তাদেরকে দূর থেকে ডাকা হচ্ছে। *[ফুসসিলাত : ৪১ : ৪৪]*

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۝

যখন কোনো সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের কেউ কেউ বলে, এটা তোমাদের কার ঈমান বাড়ালো? যারা মুমিন, এটা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারাই আনন্দিত হয়। আর যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, এটা তাদের কলুষের সাথে আরো কলুষ যুক্ত করে এবং তাদের মরণ হয় কাফের অবস্থায়। *[তাওবা : ৯ : ১২৪-১২৫]*

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۝

আল্লাহ মশা কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র কোনো বস্তুর উপমা দিতে সংকোচ বোধ করেন না। সুতরাং যারা ঈমান এনেছে, তারা জানে, নিশ্চয়ই এটা সত্য, যা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে। কিন্তু যারা কাফের, তারা বলে, আল্লাহ কী অভিপ্রায়ে এই উপমা পেশ করেছেন? এর দ্বারা অনেককেই তিনি বিভ্রান্ত করেন আবার বহু লোককে হেদায়াত দান করেন। বস্তুত তিনি পথ পরিত্যাগকারীদের ব্যতীত আর কাউকেই বিভ্রান্ত করেন না। *[বাকারা : ২ : ২৬]*

কোনো আয়াতে মুমিনদের উপর কুরআনের প্রভাব ব্যক্ত করা হয়েছে। আবার কোনো কোনো আয়াতে কাফেরদের উপর কুরআনের প্রভাব ব্যক্ত করা হয়েছে। মুমিনদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে–

هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۝

মুত্তাকীদের জন্য এটা পথ নির্দেশ, যারা অদৃশ্যে ঈমান রাখে, যথাযথভাবে নামায আদায় করে ও আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করেছি, তা থেকে ব্যয় করে। *[বাকারা : ২ : ২-৩]*

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٥

মুমিন তো তারাই, যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের সামনে তেলাওয়াত করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে। *[আনফাল : ৮ : ২]*

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٥

আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব, যা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যা পুনঃপুনঃ তেলাওয়াত করা হয়। এতে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়, অতঃপর তাদের দেহ মন বিনম্র হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। এটাই আল্লাহর পথ নির্দেশ, তিনি এর দ্বারা যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন, তার কোনো পথ প্রদর্শক নেই। *[যুমার : ৩৯ : ২৩]*

কাফের সম্প্রদায় সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে–

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ٥

এবং তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হলে তুমি কাফেরদের মুখমণ্ডলে অসন্তোষ লক্ষ করবে।

যারা তাদের নিকট আমার আয়াত তেলাওয়াত করে, তাদেরকে ওরা আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। *[হজ : ২২ :৭২]*

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ٥

আর যখন শুধু এক আল্লাহর কথা বলা হয়, তখন যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয়ে পড়ে। *[যুমার : ৩৯ : ৪৫]*

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ٥

এবং যখনই কোনো সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তারা একে অপরের দিকে তাকায় এবং ইঙ্গিতে জিজ্ঞেস করে– তোমাদেরকে কেউ লক্ষ করছে কি? অতঃপর তারা সরে পড়ে। আল্লাহ তাদের অন্তরকে সত্যবিমুখ করে দিয়েছেন। কারণ, তারা এমন এক সম্প্রদায়, যাদের বোধশক্তি নেই। *[তাওবা : ৯ : ১২৭]*

কুরআনে কারীম শুধু এতোটুকু বলেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং মুমিনদের প্রভাবিত হওয়া, উপকৃত হওয়া, শিক্ষাগ্রহণ করা আর কাফেরদের প্রভাবিত না হওয়া, উল্টো ভ্রান্তিতে আরো অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে মুমিন ও কাফের উভয়ের গুণাবলী, বৈশিষ্ট্য, চরিত্র, বিশ্বাসও তুলে ধরেছে যত্নের সাথে। এতে এ কথাই প্রমাণিত হয়, প্রভাব ফল ও পরিণামগত ব্যবধানের ক্ষেত্রে ওসব বৈশিষ্ট্য, বিশ্বাস ও গুণাবলীর হাত রয়েছে।

আমরা চাইলে এসব গুণাবলীর আলোকে কুরআন থেকে উপকৃত হওয়ার শর্তাবলী এবং উপকৃত হওয়ার পথে অন্তরায় ও বাধাসমূহ চিহ্নিত করতে পারি। আমরা সহজেই নির্ণয় করতে পারি কোন ধরনের আখলাক চিন্তা বিশ্বাস ও বৈশিষ্ট্য কুরআনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ; কোন কোন গুণ ও চরিত্র কুরআন দ্বারা উপকৃত হওয়ার পথে সহায়ক আর কোন কোন চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে এ পথে মহাঅন্তরায়। কুরআনের পাঠ ও সংস্পর্শ, বিপ্লব ও পরিবর্তন সাধন করে কী কী গুণের সমন্বয়ে আর কী কী চরিত্র সেই বিপ্লব ও পরিবর্তনের পথ রুদ্ধ করে রাখে। আমরা এখানে এসব গুণ, চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যগুলো স্বতন্ত্রভাবে খানিকটা সবিস্তারে তুলে ধরছি।

কুরআন দ্বারা উপকৃত হওয়ার পথে অন্তরায়সমূহ

কেন মানুষ কুরআন দ্বারা উপকৃত হতে পারে না, কী কারণে মানুষ কুরআনের হেদায়াত ও আলো থেকে বঞ্চিত হয়– কাফের ও মুশরিকদের আলোচনার পাশাপাশি পবিত্র কুরআন সেসব কারণ এবং অন্তরায়গুলোও চিহ্নিত করে দিয়েছে। বলা হয়েছে, কুরআন থেকে আলো গ্রহণ ও উপকৃত হওয়ার পথে এই কারণগুলো কঠিন প্রতিবন্ধক। তাই যদি কাফের সম্প্রদায় ছাড়া মুসলমানদের মধ্যে এসব চিন্তা বিশ্বাস ও চরিত্রগত অন্তরায় ও প্রতিবন্ধকগুলো পাওয়া যায়, তাহলে তারাও কুরআন দ্বারা উপকৃত হওয়ার পথে বাধাগ্রস্ত হবে। আমরা নিম্নে সেই অন্তরায়গুলো তুলে ধরছি।

১. অহংকার

নবী ও রাসূলগণের শিক্ষা, বরকত ও তাঁদের আনুগত্যের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হবার অন্যতম একটি বড় কারণ হলো অহংকার, মিথ্যা আত্মম্ভরিতা ও মূর্খতাজাত বড়ত্ববোধ। কখনো বা এই অহংকার ও বড়ত্ববোধ সত্য গ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, অনেক সময় সত্য গ্রহণ করতে গেলে ক্ষমতা ও নেতৃত্বকে বিসর্জন দিতে হয়। বর্জন করতে হয় মূর্খতাজাত অনেক প্রথা ও কুসংস্কার। লাভের অনেক মোয়া হাত থেকে ছেড়ে দিতে হয়। স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারী জীবনের পরিবর্তে আনুগত্য ও শৃঙ্খলাবরিত জীবনযাপন করতে হয়। পরিবর্তনের এই চাপ অনেকের কাছেই অসহ্য মনে হয়। তাদের আত্মম্ভরিতা, অহংকার ও বড়ত্ববোধই তাদেরকে কুরআন অস্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ করে। নিম্নে উল্লিখিত আয়াতগুলোতে এ কথাটাই বারবার ইরশাদ হয়েছে–

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ٥

পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে দম্ভ করে বেড়ায়, তাদের দৃষ্টি আমার নিদর্শন থেকে ফিরিয়ে দেবো। তারা সবগুলো নিদর্শন দেখলেও তাতে বিশ্বাস করবে না। তারা সৎপথ দেখলেও তাকে পথ বলে গ্রহণ করবে না। কিন্তু ভ্রান্ত পথ দেখলে তাকে তারা পথ হিসেবে গ্রহণ করবে। এটা এই কারণে, তারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করেছে এবং সে সম্পর্কে তারা ছিলো গাফেল। *[আ'রাফ : ১৪৬]*

وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ. يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٥

দুর্ভোগ প্রত্যেক মিথ্যাবাদী পাপীর, যে আল্লাহর আয়াতসমূহের তেলাওয়াত শোনে; অথচ ঔদ্ধত্যের সাথে অটল থাকে (কুফরীর উপর); যেনো সে তা শোনেইনি। তাকে মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ দাও। *[জাছিয়া : ৭ : ৭-৮]*

ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ

অতঃপর সে পেছন ফিরলো এবং দম্ভ প্রকাশ করলো। *[মুদ্দাছছির : ৭৪ : ২৩]*

فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ. إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ٥

এবং ঘোষণা করলো– এ তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত জাদু ভিন্ন আর কিছু নয়। এতো মানুষেরই কথা। *[মুদ্দাছছির : ৭৪ : ২৪-২৫]*

কখনো বা তারা নবীর বাহ্যিক অবস্থা ও দীনতা দেখে এই পয়গাম ও শিক্ষাকে অস্বীকার করেছে। দারিদ্রের কারণে নবীর আনুগত্যকে নিজের অপমান বলে জ্ঞান করেছে। ফেরাউন বলেছিলো–

أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ. فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ٥

আমি তো শ্রেষ্ঠ ঐ ব্যক্তি থেকে, যে হীন এবং স্পষ্ট কথা বলতেও অক্ষম। মূসাকে কেন দেয়া হলো না স্বর্ণবলয় অথবা

তার সাথে কেন ফেরেশতাগণ দলবদ্ধভাবে আগমন করলো না। *[যুখরুফ : ৪৩ : ৫২-৫৩]*

কাফের কুরাইশরা বলেছিলো–

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ○

এবং তারা বলে, এই কুরআন কেনো নাযিল করা হলো না দুই জনপদ (মক্কা ও তায়েফ)-এর কোনো প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর। *[যুখরুফ : ৩১]*

কখনো বা তারা এই অজুহাতে নবীর পয়গামকে গ্রহণ করেনি, তিনি মানুষ।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا
فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ○

ওটা এই জন্য, তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসতো। তখন তারা বলতো, মানুষই কি আমাদেরকে পথের সন্ধান দেবে? অতঃপর তারা কুফরী করলো ও মুখ ফিরিয়ে নিলো। কিন্তু এতে আল্লাহর কিছু আসে যায় না; আল্লাহ অভাবমুক্ত ও প্রশংসার্হ। *[তাগাবুন : ৪৩ : ৬]*

وَقَالُوا مَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا
أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ○

এবং তারা বললো, এ কেমন রাসূল, যে আহার করে এবং বাজারে চলাফেরা করে; তার কাছে কোনো ফেরেশতা অবতীর্ণ হলো না যে তার সঙ্গে থাকতো সতর্ককারীরূপে। *[ফুরকান : ২৫ : ৭]*

কখনো বা অনুসারীদের অর্থনৈতিক সংকট দীনতা বংশগত নিচুতা সত্য গ্রহণের পথে অন্তরায় হয়েছে, সহায়ক হয়েছে কুফরীর ক্ষেত্রে।

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا
نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ
عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ○

তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা যারা ছিলো কাফের– বললো আমরা তোমাকে তো আমাদের মতো মানুষ ভিন্ন কিছুই দেখছি না; আমরা দেখছি তোমার অনুসরণ করছে যারা আমাদের মধ্যে বাহ্যদৃষ্টিতে অধম এবং আমরা আমাদের উপর তোমাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব দেখছি না; বরং আমরা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করি। *[হূদ : ১১ : ১৭]*

কখনো কখনো পার্থিব সৌভাগ্য ও সুপ্রসন্নতাও তাদের হেদায়াত গ্রহণের পথে, কুরআনের আহ্বানে সাড়া দেয়ার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতো। কারণ, তারা ধরেই নিতো, এই পার্থিব জগতে সকল ভালো-সম্পদ ও বস্তুর অধিকারী আমরা। সুতরাং সর্বত্র সকল কল্যাণের অধিকারী আমরাই হবো। আর যা আমাদের হাতে আসে না, তা আবার কল্যাণকর ও উপকারী হবে কি করে?

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ
لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ ○

মুমিনদের সম্পর্কে কাফিররা বলে, যদি এই দীন ভালোই হতো, তাহলে তারা এর প্রতি আমাদেরকে অতিক্রম করে যেতে পারতো না। (অর্থাৎ আমরাই কুরআনকে অগ্রে গ্রহণ করতাম।) আর যখন তারা এর দ্বারা সৎ পথপ্রাপ্ত হয়নি, তখন তারা অবশ্যই বলবে, এতো এক পুরাতন মিথ্যা। *[আহকাফ : ৪৬ : ১১]*

আর এ কারণেই যে কোন জনবসতির খোশহাল ও সুঅবস্থার অধিকারী বিত্তবানরা আম্বিয়ায়ে কেরামের দাওয়াতকে সবার আগে অস্বীকার করেছে, তাদের বিরোধিতা করেছে, কঠোর ও দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে।

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ
كَافِرُونَ ○

যখনই আমি কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তার বিত্তশালী অধিবাসীরা বলেছে, তোমরা যাসহ প্রেরিত হয়েছো আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। *[সাবা : ৩৪ : ৩৪]*

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا ○

একই রূপে আমি প্রত্যেক জনপদে তথাকার অপরাধীদের প্রধানকে সেখানে চক্রান্ত করার অবকাশ দিয়েছি। *[আনআম : ৫ : ১২৩]*

সার কথা হলো, অহংকার যে কারণেই হোক, তার প্রকাশ যেভাবেই ঘটুক এটা কুরআনে কারীম থেকে উপকৃত হওয়ার পথে একটি শক্তিশালী অন্তরায়, কঠিন বাধা। অহংকার কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ, জীবনে তার রূপায়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এক বিশাল প্রতিবন্ধক। জীবনে কুরআনে কারীমকে পথপ্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করার জন্য, আম্বিয়ায়ে কেরামের (আ.) অনুসরণ ও তদ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য প্রয়োজন বিনয়, সমর্পণ, সন্তুষ্টি ও ত্যাগ। ইরশাদ হয়েছে–

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ০

কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদ বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পন না করে; অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে না নেয়। *[নিসা : ৪ : ৬৫]*

২. ঝগড়া ও বিতর্ক

কুরআনে কারীম সম্পর্কে কোনো পূর্ব ধারণা ও অধ্যবসায় ব্যতীতই বিতর্কে লিপ্ত হওয়া, মুখের জোরে, চাপাবাজি করে তাকে পরাজিত করতে চেষ্টা করা, কুরআনে কারীম সম্পর্কে অনুমাননির্ভর মত প্রকাশ করা-এসব কুরআন দ্বারা উপকৃত হওয়ার পথে অনেক বড় বাধা। অধিকন্তু অন্তর্নিহিত অহংকার ও বড়ত্বের বিষবোধের প্রমাণ। এসব অসার বিতর্ক। অর্থহীন এসব বিতর্ক বঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে না।

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ০

'যারা নিজেদের কাছে কোন প্রমাণ না থাকলেও আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাদের অন্তরে আছে কেবল অহংকার। তারা এতে সফলকাম হবে না। অতএব, তোমরা আল্লাহর শরণাপন্ন হও। তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।' *[মুমিন : ৪০ : ৫৬]*

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ ০

যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করে, তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। *[সাবা : ৩৪ : ৫]*

الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ০

যারা নিজেদের কাছে কোনো দলিল প্রমাণ ছাড়াই আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়, তাদের এই কর্ম আল্লাহ ও মুমিনদের দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃণার্হ। এভাবে আল্লাহ প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়কে মোহরাঙ্কিত করে দেন। *[মুমিন : ৪০ : ৩৫]*

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ০

এভাবে আমি জিন ও মানব শয়তানদেরকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি। প্রতারণার উদ্দেশ্যে তাদের একে অন্যকে চমকপ্রদ বাক্য দ্বারা প্ররোচিত করে। *[আনআম : ১১২]*

৩. পরকালের অস্বীকৃতি ও দুনিয়ার দাসত্ব

পরকালকে অস্বীকার করার এই কুফুরী বিশ্বাস কুরআনের দ্বারা উপকৃত হওয়ার পথে এক বিরাট অন্তরায়। কারণ, কুরআনের আশাপ্রদ ও ভীতিব্যঞ্জক বাণী, পরামর্শ, উপদেশ ও সংস্কারের মূল ভিত্তিই হলো আখেরাত। কুরআন মানুষকে

পরকাল সম্পর্কে সতর্ক করে প্রতিদানের আশ্বাস দেয়। এ পথে প্রয়োজনীয় জ্ঞান-তথ্য ও জ্ঞাতব্য বিশ্বস্ততার সাথে সরবরাহ করে। নির্দেশনা দেয় পরম দরদের সাথে। তাই যারা পরকালের প্রতি আশাবাদী, তারা কোন অবস্থাতেই মুখ ফেরাতে পারে না কুরআন মাজীদ থেকে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ○

যারা পরকালে বিশ্বাসী, তারা এই কিতাবের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং তারা তাদের নামাযের প্রতিও যত্নবান। *[আনআম : ৫ : ৯২]*

কিন্তু যারা পরকালকে স্বীকার করে না কিংবা মুখে স্বীকার করলেও কার্যত তারা দুনিয়াপূজা ও দুনিয়ার নেশায় বুঁদ হয়ে আছে, পার্থিব লাভ উন্নতি ছাড়া তারা জীবনের কোথাও কিছু ভাবে না– তারাও কুরআন দ্বারা উপকৃত হতে পারে না।

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا○

তুমি যখন কুরআন পাঠ করো, তখন তোমার ও যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না তাদের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন পর্দা রেখে দেই। আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ এঁটে দিয়েছি, যেনো তারা তা উপলব্ধি করতে না পারে এবং আমি তাদেরকে বধির করেছি। তোমার প্রতিপালক 'এক' এ কথা যখন তুমি কুরআন থেকে পাঠ করো, তখন তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে সরে পড়ে। *[বনি ইসরাঈল : ১৭ : ৪৫-৪৬]*

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ○

নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি বিশ্বাস রাখে না, আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াত দেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। *[নাহল : ১৬ : ১০৪]*

فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ○

সুতরাং যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সত্যবিমুখ এবং তারা অহংকারী। *[নাহল : ১৬ : ২২]*

فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ○

অতএব, যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ, তুমি তাকে উপেক্ষা করে চলো। সে তো কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে। তাদের জ্ঞানের দৌড় এ পর্যন্তই। তোমার প্রতিপালকই ভালো জানেন, কে তার পথ থেকে বিচ্যুৎ। তিনিই ভালো জানেন কে সৎপথপ্রাপ্ত। *[নাজম : ৫৩ : ২৯-৩০]*

পার্থিব বস্তুপ্রেম, অর্থ-বিত্তের মোহ তাদের বিবেক-বুদ্ধিকে এতোটা ভোতা করে ফেলে যে, তারা তখন বস্তু ও অর্থের ভারি পর্দা ভেদ করে অন্য কিছু ভাবতেই পারে না। ফলে ওসব কিছুকে অস্বীকার করে বসে।

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ○

নিশ্চয়ই যারা আমার সাক্ষাৎ আশা করে না এবং পার্থিব জীবনের প্রতি সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত হয়ে পড়েছে এবং আমার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে উদাসীন। *[ইউনুস : ১০ : ৭]*

بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ○

আখেরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান তো নিঃশেষ হয়েছে; তারা তো এ বিষয়ে সন্দিহান বরং তারা এ বিষয়ে অজ্ঞ। *[নামল : ২৭ : ৬৬]*

আরেকটি বিষয় আছে, যা শুধু কাফেরদের মধ্যেই নয়, অনেক মুসলমানের মধ্যেও পাওয়া যায়। তাহলো 'মুতাশাবিহাত' আয়াতকে নিজের মতলব ও

স্বার্থের পক্ষে ব্যবহার করা। বিকৃত ও ভুল ব্যাখ্যা করে অন্যদেরকে গোমরাহ ও বিপথগামী করা। অন্তরের বক্রতার কারণেই মানুষ এটা করে থাকে।

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ٥

তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যার কিছু আয়াত 'মুহকাম'। এগুলো কিতাবের মূল। আর অন্যগুলো 'মুতাশাবিহ'। যাদের অন্তরে সীমালংঘন প্রবণতা রয়েছে, শুধু তারাই ফেতনা এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহাতের অনুসরণ করে। *[আলে ইমরান : ৩ : ৭]*

কুরআনে কারীম বুঝতে সহায়ক গুণাবলী

১. অনুরাগ

কুরআন দ্বারা উপকৃত হতে হলে প্রথম শর্ত হলো ভেতরে অনুরাগ সৃষ্টি করতে হবে। যার মধ্যে কুরআনে কারীমের প্রতি কোন টান, আকর্ষণ ও অনুরাগ নেই, সে কুরআনের বাণীতে প্রভাবিত আলোড়িত হতে পারবে না। এটা আল্লাহ তায়ালার এক শাশ্বত নিয়ম। যার মধ্যে অনুরাগ আছে, তাকে তিনি উপুড় করে দেন। তাঁর দরবারে অনুরাগ খুবই মূল্যবান সম্পদ। নিজের বর্তমান অবস্থার প্রতি অতৃপ্তি নিজেকে সংশোধনের প্রতি অস্থির সাধনা আর পথের সন্ধানে অবিরাম প্রচেষ্টা এ পথে সফলতার প্রথম সিঁড়ি। তাঁর প্রতি সমর্পণ প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা অবস্থার রূপান্তর।

وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ

যারা তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তিত হয়, তিনি তাদেরকেই হেদায়াত দান করেন। *[রাদ : ১৩ : ২৭]*

وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

যারা তাঁর প্রতি সমর্পিত হয়, তিনি তাদেরকেই সুপথে চালিত করেন। *[শূরা : ৪১ : ১৩]*

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ٥

কোন জাতি যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন না ঘটায়, আল্লাহ তায়ালা ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটান না। *[রাদ : ১৩ : ১১]*

দীনের ক্ষেত্রে আত্মতুষ্টি, অমুখাপেক্ষিতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণভাব বঞ্চনা ও দুর্ভাগ্যের লক্ষণ।

এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে–

فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٥

অতঃপর তারা কুফুরী করলো ও মুখ ফিরিয়ে নিলো। কিন্তু এতে আল্লাহর কিছু আসে যায় না; আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ। *[তাগাবুন : ৬৪ : ৬]*

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ○

হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর কাছেই ঠেকা। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি তো শুধুই প্রশংসার যোগ্য। *[ফাতির : ৩৫: ১৫]*

যাদের মধ্যে দীনের প্রতি অনুরাগ নেই, দীনের আহ্বানে যারা প্রাণের সাড়া অনুভব করে না, তাদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে–

أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ○

তুমি কি বধিরকে শোনাতে পারবে– তারা না বুঝলেও? *[ইউনুস : ১০ : ৪২]*

أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ○

তুমি কি অন্ধকে পথ দেখাবে, তারা না দেখলেও? *[ইউনুস : ৪৩]*

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. وَمَا أَنتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ○

মৃতকে তো তুমি কথা শোনাতে পারবে না, বধিরকেও পারবে না আহ্বান শোনাতে– যখন তারা পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়। তুমি অন্ধদেরকে তাদের ভ্রষ্টতা থেকে পথে আনতে পারবে না। তুমি শোনাতে পারবে কেবল তাদেরকে, যারা আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে। আর তারাই আত্মসমর্পণকারী। *[নামল : ২৭ : ৮০-৮১]*

২. মনোযোগসহ শ্রবণ ও অনুসরণ

এতে কোন সন্দেহ নেই, কুরআন একটি কিতাব, একটি শিক্ষা, একটি জীবন্ত নির্দেশনা। কুরআন থেকে পাথেয় লাভ করতে হলে প্রথমেই তাকে গভীরভাবে মনোযোগসহ শ্রবণ করতে হবে। যদি কেউ ধ্যানসহ না শোনে, তাহলে সে এ থেকে কী লাভ করবে!

فَبَشِّرْ عِبَادِ. الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ○

অতএব, আমার বান্দাদেরকে সুসংবাদ দাও, যারা মনোযোগসহ কথা শোনে এবং তার মধ্যে যা উত্তম তা গ্রহণ করে। তাদেরকে আল্লাহ সৎ পথে পরিচালিত করেন এবং তারাই বোধশক্তিসম্পন্ন। *[যুমার : ৩৯ : ১৭-১৮]*

তবে শুধু মনোযোগসহ শোনলেই হবে না। যতটুকু আমলের কথা আছে, তা বাস্তবায়ন করতে হবে। কারণ, আমলহীন ইলম হলো মানসিক বিলাসিতা মাত্র। তাই গভীরভাবে শ্রবণ করার পর তার অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছে এ আয়াতে।

৩. ভয়

কুরআনে কারীমের মূল ভিত্তি হলো আল্লাহর ধ্যান ও আল্লাহ ভীতির উপর। সুতরাং যার মধ্যে আল্লাহর ভয় নেই, আল্লাহ ও তাঁর পবিত্র নামের প্রতি যার কোন আকর্ষণ নেই; মূলত তার অন্তরে দীনের কোন অস্তিত্বই নেই। সে প্রকৃতপক্ষে দীন থেকে বঞ্চিত। ধর্মীয়-দীনি অনুভূতি বলতে কিছুই নেই তার ভেতর। যার মধ্যে অনুভব শক্তি নেই, সে কিভাবে উপলব্ধি করবে?

কুরআন তারই হৃদয়ে প্রভাব ও আবেদন সৃষ্টি করে, যার হৃদয়ে 'আল্লাহ' নামের আবেদন আছে। যার হৃদয়ে লুকায়িত আছে ভালোবাসার কোনো চাপাপড়া অঙ্গার।

আর হৃদয় যার জড় নিষ্প্রাণ উত্তাপহীন, সে কুরআন যতো মন দিয়েই শুনুক, তাপ সৃষ্টি হবে না।

ইরশাদ হচ্ছে–

فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ o

যে আমার হুঁশিয়ারীকে ভয় করে, তাকে তুমি কুরআন দ্বারা উপদেশ দিতে থাকো। *[কাফ : ৫০-৪৫]*

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ o

তুমি তো কেবল তাকেই ভীতিপ্রদর্শন করতে পারবে, যে কুরআনের অনুসরণ করে আর না দেখেই আল্লাহকে ভয় করে। *[ইয়াসিন : ১১]*

سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ

যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে, তারা শীঘ্রই শিক্ষাগ্রহণ করবে। *[আ'লা : ৮৭ : ১০]*

فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ o

আল্লাহর স্মরণের প্রতি হৃদয় যাদের কঠোর, তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস। *[যুমার : ৩৯ : ২২]*

৪. অদৃশ্যে বিশ্বাস

ইসলামের একটি বড় ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে, যা মানুষের ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও আকল বুদ্ধির বাইরে। দীনের অনেক বিষয় আছে, যা মানুষ তার পঞ্চইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করতে অক্ষম। এসব ধরাও যায় না, দেখাও যায় না। যার ঘ্রাণ নেই, স্বাদ নেবারও উপায় নেই। বিবেক খাটিয়ে তা উদ্ধার করা যায় না। কারণ, আকল-বুদ্ধির ক্ষমতা শুধু এইটুকু, সে পঞ্চইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত বিষয়গুলোর আলোকে অনুভূতির বাইরে অজানা কিছু বিষয়ের জ্ঞান লাভ করতে পারে। আর যেসব বিষয় ইন্দ্রিয় ও অভিজ্ঞতা দ্বারা জানা যায় না তার প্রাথমিক ধারণা পর্যন্ত অর্জন করা যায় না। যেখানে কিয়াস ও অনুমানের কোনো অবকাশই নেই, সেখানে অবলা আকল কিইবা করবে?[১]

আল্লাহ তায়ালার গুণাবলী, ওহী, ফেরেশতা, আখেরাত, জান্নাত দোযখ– এসব বিষয় মোটেও আকলপরিপন্থী নয়। তবে মানববুদ্ধির উর্ধ্বে অবশ্যই। এসবই অদৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত। এসব ক্ষেত্রে পূর্ণ আস্থা ও ভরসা করতে হয় হযরাতে

[১]. বিস্তারিত জানার জন্য লেখকের 'মাযহাব ওয়া তামাদ্দুন' (১৪-২০পৃ.) গ্রন্থটি দেখুন।

আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-এর উপর। তাদের উপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসাসহ তাদের মাধ্যমে প্রাপ্ত কথাগুলোকে গ্রহণ করে নেয়াকেই 'অদৃশ্যের প্রতি ঈমান' বলা হয়। এরই নাম অদৃশ্যে বিশ্বাস। যারা বস্তু ও ইন্দ্রিয়ার্জিত বিষয় ব্যতীত অন্য কিছুর প্রতি বিশ্বাস রাখে না, আকল ও বিবেকোর্ধ্ব বিষয়ের প্রতি যাদের আস্থা ও বিশ্বাস নেই, তারা এসব বিষয়কে সরাসরি অস্বীকার করে বসে। প্রকৃতপক্ষে তারা দীনের প্রকৃত মর্ম সম্পর্কেই অজ্ঞ। তাদের পক্ষে দীনের ভেতর প্রবেশ করাও প্রায় অসম্ভব। এই শ্রেণীর লোকেরা কুরআন দ্বারা উপকৃত হতে পারে না। কুরআনের ছত্রে ছত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয় এরা।

পক্ষান্তরে যারা ইন্দ্রিয়পূজারী নয়, যারা সৃষ্টির সীমানাকে আরো বিস্তীর্ণ মনে করে, যারা সৃষ্টিকে দেখা ও প্রাপ্ত বিষয়াবলীর মধ্যেই সীমিত মনে করে না; তারাই মূলত দীনের মর্ম বুঝতে সক্ষম। তারা মনে করে, শুদ্ধ ও অকাট্য জ্ঞানের উৎস একমাত্র এলাহী ওহী। তারা নবীগণের সংবাদ ঘোষণা ও শিক্ষার প্রতিও পরিপূর্ণ ভরসা করে। আম্বিয়া কেরামের প্রতি তাদের আস্থা অনড়। এই শ্রেণীর মানুষের জন্য কোন কিছুই অসাধ্য ও কঠিন নয়। তাদের কাছে পূর্ণ দীনই এক অকাট্য বাস্তব। কুরআনের পুরোটাই তাদের জন্য হেদায়াত ও আলোকবর্তিকা।

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ o

এই কুরআন সেই আল্লাহ ভীরুদের জন্য পথপ্রদর্শক, যারা অদৃশ্যে বিশ্বাসী। *[বাকারা : ২ : ২৩]*

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ o

সুতরাং যারা ঈমান এনেছে তারা জানে, নিশ্চয়ই এটা সত্য, যা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে। কিন্তু যারা কাফের তারা বলে আল্লাহ কী অভিপ্রায়ে এই উপমা পেশ করেছেন? এর দ্বারা তিনি অনেককেই বিভ্রান্ত করেন। আবার বহু লোককে সন্ধান দেন সৎপথের। বস্তুত তিনি পথ পরিত্যাগীদের ব্যতীত আর কাউকেই বিভ্রান্ত করেন না। *[বাকারা : ২ : ২৬]*

যারা বস্তুতন্ত্রের শিকার, ইন্দ্রিয়জালে যারা ঘোর আক্রান্ত, তারা অদৃশ্য বিশ্বাসের আলোক শিখা ব্যতীতই আকলোর্ধ্ব বিষয়াবলীর জটিল গ্রন্থি উন্মোচন করতে চায়। এ যেনো সিঁড়ি ভাঙ্গা ছাড়াই উপরে উঠার নিষ্ফলা কসরত। ডানা ছাড়া কি ওড়া যায়? তাই তারা যতোই উপরে ওঠার মানসে দাপাদাপি করছে, ততোই বস্তুতন্ত্রের গভীর পংকে মিলিয়ে যাচ্ছে। গতি অধঃগতির শেষ চিহ্নকে আলিঙ্গন করেও স্থির হচ্ছে না। তাদের এই কসরত ও সাধনার কথা কুরআন তার অলৌকিক সাহিত্য শিল্প মিশিয়ে উপস্থাপন করেছে এই ভাবে–

فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٥

আল্লাহ কাউকে সৎপথে পরিচালিত করতে চাইলে তিনি তার বক্ষ ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন এবং কাউকে বিপথগামী করতে চাইলে তিনি তার বক্ষ অতিশয় সংকীর্ণ করে দেন। তার কাছে (তখন) ইসলামের অনুসরণ আকাশে আরোহণের মতোই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। যারা ঈমান আনে না, আল্লাহ তাদেরকে এভাবেই লাঞ্ছিত করেন। *[আন'আম : ৬ : ১২৫]*

৫. চিন্তা-ভাবনা

কুরআনে কারীম থেকে আলো গ্রহণ করতে হলে, উপকৃত হতে হলে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। পবিত্র কুরআন মানবজাতিকে চিন্তা-ভাবনার প্রতি আহ্বান করেছে। বলেছে, যারা ঈমানদার, তারা বুঝে শুনে কুরআন তেলাওয়াত করে। অন্ধ ও বধিরের মতো আপতিত হয় না।

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ٥

আর তাদেরকে যখন তাদের প্রভুর কথা বলে বুঝানো হয়, তখন তারা বধির ও অন্ধের মতো আপতিত হয় না (বরং গভীর মনোযোগসহ শোনে)। *[ফুরকান : ২৫ : ৭৩]*

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ٥

তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না? না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ? *[মুহাম্মদ : ৪৭ : ২৪]*

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ٥

আচ্ছা, তারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশসহ চিন্তা-ভাবনা করে না কেন? যদি এটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো (বাণী) হতো, তাহলে তারা এতে বিপুল অসঙ্গতি পেতো। *[নিসা : ৪ : ৮২]*

৬. মুজাহাদা

কুরআনে কারীমকে বুঝতে হলে, কুরআনের মর্ম ও পয়গাম সম্পর্কে ভাবতে হলে কিছু না কিছু মুজাহাদা সাধনা অবশ্যই করতে হয়। কুরআন মানবরচিত গ্রন্থাবলীর মতো নয় যে, পাঠক তার মেধা ও জ্ঞানের ভিত্তিতে লেখকের উদ্দেশ্যে বুঝে ফেলবে কিংবা আলোচ্য বিষয়গুলো আয়ত্ত ও আত্মস্থ করে ফেলবে।

আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য বুঝতে হলে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সাহায্য লাভ করতে হবে অবশ্যই। মানুষ যখন সাধনার সিঁড়িতে পা রাখে, চরিত্রের পবিত্রতা ও আত্মশুদ্ধিতে সচেষ্ট হয়, তখন খোদার রহমত ঝুঁকে পড়ে তার প্রতি। আল্লাহ তায়ালা তার হৃদয়কে কুরআনের জ্ঞানে প্রশস্ত করে দেন। উপলব্ধির দৌলতে ধন্য করেন তার ভেতরটাকে। আর কুরআন যেহেতু খুবই সূক্ষ্ম একটি বিষয়। তাই বস্তুতান্ত্রিক আবিলতা থেকে যতোই মুক্ত করে তুলবে নিজেকে, ততোই সম্বন্ধ পাকা হয়ে ওঠবে কুরআনের সাথে। কুরআনের সৌন্দর্য, শিল্প ও নূর ততোই উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে চোখের সামনে।

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ٥

আর যারাই আমার জন্য সাধনা করবে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথ বাতলে দেবো। আল্লাহ তো সৎলোকদের সাথেই থাকেন। *[আনকাবুত : ২৯ : ৬৯]*

দ্বিতীয়ত, মানুষ যখন কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য কষ্ট করে, সাধনা করে, ত্যাগ ও বিসর্জনের পথে অবতীর্ণ হয়, তখন এক বিশেষ ভাব ও কাইফিয়্যাত আচ্ছাদিত

করে রাখে তাকে। আর তখনই সে অর্জনের স্বাদ, সাধনার মর্মমধু পূর্ণ মাত্রায় অনুভব করতে পারে।

তৃতীয়ত, কুরআনের বিরাট একটি অংশ আমলের সাথে সম্পৃক্ত। শুধু চিন্তা ও ভাবের মাধ্যমে তা অর্জন হয় না। শব্দাবলীর অর্থ ও মর্ম হয়তো উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু মূল মর্ম, প্রকৃত রূপ, নিগূঢ় আবেদন আমল ও অভিজ্ঞতা ব্যতীত অর্জন করা যায় না। কুরআনের মর্ম উপলব্ধির ক্ষেত্রে এটা ছিলো সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৭. আদব ও আযমত

কুরআনে কারীম দ্বারা উপকৃত হতে হলে, হেদায়াত ও আলো লাভ করতে হলে, হৃদয় ও আত্মাকে কুরআনের রসে সিঞ্চিত ও প্রাণিত করতে হলে শুরুতেই একথা গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করে নিতে হবে, কুরআন কোন তথ্যভিত্তিক গ্রন্থ কিংবা নিয়মনীতি ও আইন সংকলন নয় যে, তার বিষয়বস্তু ও মূল তথ্যগুলো জেনে নিলেই হবে। তারপর আর তার কোন প্রয়োজন নেই।

বরং কুরআন হলো আহকামুল হাকিমীন সকল বাদশাহর বাদশাহ, সবার মালিক ও মনিবের কালাম।

সৌন্দর্য, পূর্ণতা দান ও অনুগ্রহের সকল গুণের যিনি আধার, তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে–

هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ○

তিনিই তো আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই। তিনিই প্রকৃত বাদশাহ, পূতঃপবিত্র তাঁর সত্তা, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, রক্ষাকারী, বিজয়ী, পরাক্রমশালী ও সর্বমহান। *[হাশর : ২৩]*

তিনি তাঁর কালাম সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন–

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ○

এই কুরআন যদি আমি কোন পর্বতের উপর অবতরণ করতাম, তাহলে তুমি দেখতে খোদার ভয়ে সে নত ও দীর্ণ হয়ে পড়েছে। আর আমি এই উপমাগুলো মানুষকে বলি যাতে তারা চিন্তা করে। *[হাশর : ৫৯ : ২১]*

আরও ইরশাদ করেন–

فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ. مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. كِرَامٍ بَرَرَةٍ ○

আদব ও সম্মানযোগ্য পাতায় (লিখিত হয়েছে) সুউচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত ও পবিত্র, নেতৃস্থানীয় ও কল্যাণপরায়ণ লেখকদের হাতে। *[আবাসা : ৮০ : ১৫]*

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ. لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ ○

বড়ই সম্মানিত এই কুরআন। কিতাবে মাহফুযে (লিখিত) আর তাকে কেবল পবিত্রজনরাই স্পর্শ করতে পারে।[১] *[ওয়াকিয়াহ : ৫৬ : ৭৯]*

কুরআনের এই উচ্চমর্যাদা, পবিত্র অস্তিত্বের এক স্বাভাবিক পরিণাম হলো, এই কালাম ও তার অবতরণকারী প্রভুর সাথে যাদের সামান্য পরিচয় ও সম্পর্ক আছে, তারা কখনোই এর প্রভাবমুক্ত ও বঞ্চিত থাকতে পারে না। ইরশাদ হয়েছে–

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ○

---

[১]. আল্লামা শিব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.) তাঁর লেখা বিখ্যাত টীকায় লিখেন– 'অর্থাৎ পবিত্র লোকদের ব্যতীত কেউ এ গ্রন্থ স্পর্শ করতে পারবে না। এর অর্থ হলো, পরিচ্ছন্ন হৃদয় ও পবিত্র চরিত্র ব্যতীত কেউ এই গ্রন্থের মূল মর্ম পর্যন্ত পৌছতে পারবে না। অথবা এর অর্থ হলো, ওযু ব্যতীত এই গ্রন্থ স্পর্শ করা নাজায়েয। একথা বিপুল পরিমাণ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত। এই দ্বিতীয় অর্থ হিসেবে আরবী ব্যাকরণ মতে আয়াতে উল্লিখিত 'নাফী'– 'নাহী'-এর অর্থে ব্যবহৃত হবে।' অর্থাৎ আল্লামা উসমানী কৃত প্রথম অর্থটি গ্রহণ করা হলে আরবী ব্যাকরণ মতে 'খবর' হবে আর দ্বিতীয় অর্থ হিসেবে হবে 'ইনশা'। এ সুবাদে ইমাম ইবন কাসীর লিখেন– ولفظ الاية خبر ومعناها الطلب، قالوا: والمراد بالقران ههنا المصحف। তারপর তিনি মুয়াত্তা ও ইমাম আবু দাউদ (রহ.)-এর মারাসীলে উল্লিখিত একটি হাদীস উদ্ধৃত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– ولا يمس القران الا طاهر – কুরআনকে একমাত্র পবিত্র ব্যক্তিই স্পর্শ করতে পারবে।' ইমাম ইবন কাসীর হাদীসটি নির্ভরযোগ্য বলে মত প্রকাশ করেছেন। এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলো যদিও সনদগতভাবে দুর্বল, তবুও হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি অনুসারে অবশ্যই এর ভিত্তি আছে– এর দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্যও।

আর যখন তাদেরকে তার আয়াতগুলো তেলাওয়াত করে শোনানো হয়, তখন তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পায়। আর তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে। *[আনফাল : ৮ : ২]*

আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করেছেন–

اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍo

আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী অবতীর্ণ করেছেন– এমন এক গ্রন্থ, যার প্রতিটি অংশ একই বর্ণের, যাতে বিষয়াবলী বারবার পুনঃউল্লিখিত হয়েছে। এই কালাম শ্রবণে তাদের দেহ কেঁপে ওঠে, যারা তাদের প্রভুকে ভয় করে; অতঃপর তাদের দেহ প্রাণ কোমল হয়ে আল্লাহর স্মরণের প্রতি সমর্পিত হয়। এই হলো আল্লাহর হেদায়াত; যাকে খুশি তাকে তিনি এর সন্ধান দেন। আর তিনি যাকে পথভ্রান্ত করেন, তার কোন হেদায়াতকারী নেই। *[যুমার : ৩৯ : ২৩]*

এ জাতীয় তেলাওয়াতকারীদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে–

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَo

যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি, তারা তা যথাযথভাবে তেলাওয়াত করে এবং তার উপর সত্য দিলে বিশ্বাস করে। আর যারা তাকে অস্বীকার করবে, তারা হবে ক্ষতিগ্রস্ত। *[বাকারা : ২ : ১২১]*

অর্থাৎ যতোটা সম্মান ও মর্যাদার সাথে মহান মালিকের বাণী পাঠ করতে হয়, যতোটা আকর্ষণ ও অনুরাগসহ প্রিয়তমের পয়গাম পড়তে হয়, তারা ঠিক সেভাবেই পড়ে। এই মহিমাময় উপলব্ধি ও অনুরাগ অন্তরে জাগ্রত করতে হলে প্রথমত কুরআনে কারীমের মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলো মনোযোগসহ পাঠ

করতে হবে।[১] দ্বিতীয়ত সাহাবা, তাবিঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, ফুকাহা, মুহাদ্দিসীন, সালিহীন, আউলিয়ামে কেরাম, আরিফীনের জীবনী ও তাদের ঘটনাবলী পাঠ করা যেতে পারে।

এতে হৃদয়চক্ষু খুলে যায়, অন্তরে প্রাণ সৃষ্টি হয়, মৃত চেতনায় জেগে ওঠে ভাবের তরঙ্গ। কারণ, এসব জীবনী ও ঘটনায় কুরআনে কারীমের প্রতি তাদের আদব প্রেম সম্পর্ক বন্ধন ও আকর্ষণের অবস্থা, রূপ ও অনুরাগের কথা বিধৃত হয়েছে জীবন্ত ভাষায়।

আমরা এখানে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলীর সূত্রে নমুনাস্বরূপ কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরছি। এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে সাহাবা, তাবিঈন ও তাদের অনুসারী উলামা-সালিহীন পবিত্র কালামে পাককে কতটা ভালোবাসতেন, কুরআনের প্রতি তাদের মথিত আবেগ সম্পর্ক নিগূঢ় বন্ধন ও হৃদ্যতার কথা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে।[২]

---

[১]. উর্দু ভাষায় এ সম্পর্কে শাইখুল হাদীস যাকারিয়া (রহ.) লিখিত 'ফাযায়েলে কুরআন'গ্রন্থটি খুবই উপকারী বলে প্রমাণিত। [হালে বাংলা ভাষায় এর মূলানুগ তরজমা করেছেন মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ(দা.)। –অনুবাদক।

[২]. নিম্নবর্ণিত গ্রন্থগুলোতে এ জাতীয় ঈমানউদ্দীপক ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে বিপুলভাবে– ক. কিতাবু কিয়ামিল লাইল, মুহাম্মদ ইবন নাসর আলমাযুরী (রহ.), খ. সিফাতুস সাফওয়াহ, ইবনুল জাওযী (রহ.), গ. ইহইয়াউল উলূম, ইমাম গাযালী (রহ.), ঘ. হিলয়াতুল আউলিয়া, আবু নুয়াঈম ইস্পাহানী (রহ.)।

কুরআনের তেলাওয়াত ও ভাবনা সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনা

উল্লিখিত বিষয়ে আমরা সাহাবা, তাবিঈন, আইম্মায়ে ইসলাম, জ্ঞানগভীর আলেম সম্প্রদায় উচ্চ মর্যাদার অধিকারী মাশায়েখ ও আউলিয়ায়ে কেরামের কিছু ঘটনা তুলে ধরছি। এসব ঘটনা পাঠ করলে কুরআনের প্রতি আদব-সম্মান, কুরআনের সাথে তাদের প্রেম ও অনুরাগ, কুরআনের সাথে তাদের অসামান্য সম্পর্ক, কুরআন তেলাওয়াতে তাদের ভাষাতীত মগ্নতা, কুরআন পাঠে তাদের স্বাদ ও অনুভূতির সন্ধান পাওয়া যায় খুবই সহজে।

এ সুবাদে আমরা প্রথমেই সরাসরি সেই মহান পবিত্র সত্তার উপমা তুলে ধরছি, যাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এই কুরআন। সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, একবার হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি আমাকে কুরআন পড়ে শোনাও।

আমি বললাম, কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে আপনার উপর আর আমি আপনাকে তেলাওয়াত করে শোনাবো? তিনি বললেন, শোনাও; আমি অন্যের মুখ থেকে শুনতে চাই।

আমি সূরা নিসা পড়তে শুরু করলাম। পড়তে পড়তে যখন এই আয়াতে পৌঁছলাম–

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۝

তখন কী অবস্থা হবে, যখন আমি প্রতিটি উম্মত থেকে একজন করে সাক্ষী উপস্থিত করবো আর সকলের বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করবো আপনাকে? *[নিসা : ৪ : ৪১]*

এ আয়াত তেলাওয়াত করার পর এক ব্যক্তি আমার হাত ধরে টান দেয়। আমি মাথা তুললাম। দেখি, হযরতের চোখ বেয়ে দর দর করে অশ্রু ঝরছে।[৩]

একবার হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা মাইদার এই আয়াতটি পড়তে পড়তে পূর্ণ রাত কাটিয়ে দেন। আয়াতটি হলো–

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

[৩]. কিয়ামুল লাইল, ৫৭ পৃ., এই হাদীসটি বুখারী এবং মুসলিম শরীফেও আছে।

তুমি যদি তাদেরকে আযাব দাও, তাহলে তারা তো তোমারই বান্দা। আর যদি ক্ষমা করে দাও, তাহলে নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। *[মাইদা : ৫ : ১১৮]*

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ছিলেন অত্যন্ত কোমল মনের মানুষ। কুরআনে কারীম পড়ার সময় তিনি চোখের পানি ধরে রাখতে পারতেন না। অঝোরে চোখের পানি বয়ে যেতো বহতা ঝর্নার মতো। হযরত আবু রাফি' (রা.) বলেন, আমি একদিন হযরত উমর (রা.)-এর পেছনে ফজর নামায পড়ছিলাম। আমি ছিলাম পুরুষদের সর্বশেষ কাতারে। আমার পরই মহিলাদের কাতার। তিনি নামাযে সূরা ইউসুফ পড়ছিলেন। যখন এই আয়াতে পৌঁছলেন–

إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ۝

[ইয়াকুব বললো] আমি তো আমার ব্যথা-বেদনার সকল অভিযোগ আল্লাহর কাছে পেশ করছি...। *[ইউসুফ : ১২ : ৮৬]*

উমর (রা.) এমনিতেই উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াত করতেন। এই আয়াত পড়ার সময় তিনি এমনভাবে ডুকরে কাঁদছিলেন, আমি পেছনের সারি থেকে তাঁর ক্রন্দনধ্বনি শুনছিলাম। হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেছেন, আমি একদিন উমর (রা.)-এর পেছনে ফজর নামায পড়ছিলাম। তিনি এমনভাবে কাঁদছিলেন, আমি চতুর্থ সারিতে দাঁড়িয়ে তার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম।

প্রখ্যাত তাবিঈ হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন, হযরত উমর (রা.) রাতের তেলাওয়াতে কখনো কখনো কোন কোন আয়াত তেলাওয়াত করার সময় কাঁদতে কাঁদতে পড়ে যেতেন, অসুস্থ হয়ে পড়তেন। মানুষ তখন তাঁকে দেখতে পর্যন্ত আসতো।[১]

মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (রহ.) বলেন, হযরত উসমান (রা.) এক রাকাতে পূর্ণ কুরআন খতম করতেন এবং পূর্ণ রজনী পার করে দিতেন।[২]

ইমাম আহমাদ (রহ.) ও ইবনে আসাকির (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, হযরত উসমান (রা.) বলেন, যদি তোমাদের অন্তর পবিত্র হয়ে যায়, তাহলে তোমরা কুরআন তেলাওয়াতে কখনোই তৃপ্ত হতে পারবে না। তৃষ্ণা থেকেই যাবে। আমি আমার জীবনে এমন দিন চাই না, যেদিন আমি দেখে কুরআনে তেলাওয়াতের

[১]. ইমাম মুহাম্মদ ইবন নুসর মারুযীর 'কিয়ামুল লাইল'গ্রন্থ থেকে চয়িত।
[২]. আল-ইসতিআব, ২য় খণ্ড, ৪৪৮ পৃ. হায়দারাবাদ, ১৩১৯ ঈ.।

সুযোগ পাবো না। হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর দেখা গেছে, তিনি কুরআনে কারীমের যে কপিটি তেলাওয়াত করতেন, অধিক ব্যবহারের কারণে সেটি জীর্ণ হয়ে গেছে।[৩]

ইবনে উমাইর (রহ.) বলেন, হযরত উসমান (রা.)-এর পেছনে নামায পড়তে পড়তে আমার সূরা ইউসুফ মুখস্থ হয়ে গিয়েছিলো। কারণ, তিনি প্রায়ই ফজর নামাযে সূরা ইউসুফ তেলাওয়াত করতেন।[৪]

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর হযরত আলী (রা.) কুরআন হেফয করার প্রতি এতোটা মনোযোগী হয়েছিলেন, কয়েকদিন চলে যেতো তিনি ঘর থেকে বের হতেন না।[৫]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে 'আস (রা.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.)-এর মতো বড় বড় সাহাবী বিখ্যাত তাবিঈন যেমন হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর, মালিক ইবনে আনাস, মানসুর ইবনুল মু'তামির প্রমুখের কুরআন শ্রবণে কেঁদে অস্থির হওয়া সম্পর্কে প্রচুর ঘটনা হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থে সংরক্ষিত আছে।

যারারাহ ইবনে আওফা (রহ.) সম্পর্কে এ কথাও বর্ণিত আছে, তিনি জামে মসজিদে নামায পড়াচ্ছিলেন। যখন সূরা মুদ্দাচ্ছির-এর এই আয়াতটিতে পৌছলেন–

فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۝

> অতঃপর যখন সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, সে দিনটি কাফেরদের জন্য অত্যন্ত কঠিন দিন হবে– সহজ দিন হবে না। *[মুদ্দাচ্ছির : ৭৪ : ৮-১০]*

এই আয়াত তেলাওয়াত অবস্থায় তার মৃত্যু হয়ে যায়। হযরত বাহ্য ইবনে হাকীম (রহ.) বলেন, যারা তাঁর লাশ বহন করেছিলো, আমিও তাদের একজন ছিলাম। হযরত খুলাইদ (রহ.) নামায পড়ছিলেন। তিনি নামাযের মধ্যে كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ (সকল প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে) আয়াতটি বারবার

৩. হায়াতুস সাহাবাহ, মাওলানা ইউসুফ (রহ.) ৪র্থ খণ্ড, ২৩-২৪ পৃ. দামেশক।
৪. ইযালাতুল খাফা, মাকসাদের দোয়াম, ১২৮ পৃ.
৫. ইসতিআব, ২য় খণ্ড, ৪৭৭ পৃ.

পড়ছিলেন। কেউ একজন ঘরের কোণ থেকে চিৎকার করে বললো, এই একটি আয়াত আর কত পড়বেন? জানি না কত মানুষের অন্তর দীর্ণ হয়েছে এর আঘাতে!...

হযরত আসমা বিনতে আবু বরক (রা.)-এর খাদেম হামযা বলেন, হযরত আসমা আমাকে বাজারে পাঠালেন। তিনি তখন সূরা ত্বাহা পড়ছিলেন। ووقانا عذاب السموم পর্যন্ত পৌছেছেন তখন। আমি বাজারে গেলাম। ফিরে এলাম, দেখি এখনো তিনি ওই আয়াতেই আছেন।

হযরত তামীমদারী (রহ.) মাকামে ইবরাহীমে এসে সূরা জাছিয়া তেলাওয়াত করতে শুরু করলেন–

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝

> যারা মন্দ কাজে লিপ্ত, তারা কি ভেবেছে, আমি তাদেরকে ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের মতোই রাখবো? তাদের জীবন ও মরণ কি একই রকম হবে? তারা খুবই মন্দ ফয়সালা করছে। *[জাছিয়া : ৪৫ : ২১]*

তিনি এই আয়াতটি বারবার পড়ছিলেন আর কাঁদছিলেন। অনন্তর এই একই আয়াত তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে ভোর হয়ে গেলো।

হযরত সাঈদ ইবনুল জুবাইর (রহ.) রমযান মাসে ইমামতি করছিলেন। যখন তিনি নামাযে তেলাওয়াত করলেন–

فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ. فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ۝

> শীঘ্রই তারা জানতে পারবে– যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃঙ্খল থাকবে, তাদেরকে টেনে নেয়া হবে ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাদেরকে দগ্ধ করা হবে আগুনে। *[মুমিন : ৪০ : ৭০-৭২]*

অতঃপর বারবার কেবল এই একই আয়াত তেলাওয়াত করতে লাগলেন। এক রাতে তাহাজ্জুদে তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন–

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۝

সেদিনকে ভয় করো, যেদিন তোমাদের সকলকেই ফিরিয়ে নেয়া হবে আল্লাহর কাছে। *[বাকারা : ২ : ২৮১]*

তিনি আয়াতটি বিশ বারের বেশি তেলাওয়াত করেন। বর্ণিত আছে, তিনি রাতে এতো বেশি কাঁদতেন, তার চোখে কান্নার ছাপ পড়ে থাকতো।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর শিষ্য হযরত মাসরূক (রহ.) কোনো কোনো রাতে এশার নামাযের পর থেকে ফজর পর্যন্ত নামাযে দাঁড়িয়ে শুধু সূরা রা'দই তেলাওয়াত করতেন।

হারুন ইবনে আয়াব আসাদী (রহ.) কখনো কখনো তাহাজ্জুদ নামাযে শুধু এই একটি আয়াত তেলাওয়াত করতে করতে পূর্ণ রাত পার করে দিতেন।

يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

বলবে, আহা! আমাদেরকে যদি পুনরায় (দুনিয়াতে) ফেরত পাঠানো হতো, তাহলে আমাদের প্রভুর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করতাম না। তখন আমরা ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। *[আন'আম : ৬ : ২৭]*

বিখ্যাত তাপস তাবিঈ হযরত হাসান বসরী (রহ.) একটি পূর্ণ রজনী শুধু এই একটি আয়াত তেলাওয়াতে কাটিয়ে দেন–

وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۝

তোমরা যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা করো, তাহলে গুণে শেষ করতে পারবে না। *[নাহল : ১৬ : ১৮]*

যখন সকাল হলো, তখন অনেকেই এর কারণ জিজ্ঞেস করলো। বললেন, এর মধ্যে অনেক বড় শিক্ষা ও উপদেশ নিহিত রয়েছে। যখনই চোখ তুলে তাকাই, আল্লাহর কোন না কোন নেয়ামত বর্ষিত হতে দেখি। অনেক নেয়ামত আমরা দেখি না। এর সংখ্যাই বেশি।[১]

হযরত ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ.) এক রাতে এই আয়াতটি তাহাজ্জুদে বারবার তেলাওয়াত করতে থাকেন। এভাবে ভোর হয়ে যায়।[২] আয়াতটি হলো–

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ ۝

---

১. এসব ঘটনা 'কিয়ামুল লাইল' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

২. আল খায়রাতুল হিসান, শাইখ আহমাদ ইবনে হাজর আল মাক্কী।

কিন্তু তাদের সাথে মূল ওয়াদা তো হলো কেয়ামত দিবসের। আর কেয়ামত খুবই ভয়ানক ও অসহ্য। *[কামার : ৫৪ : ২৬]*

কুরআনে কারীমের প্রতি এই অপার প্রেম, অনুরাগ ও হৃদ্যতার ধারাবাহিকতা বংশের পর বংশ, কালের পর কাল ধরে অব্যাহত থাকে আপন মহিমায়। ভালোবাসার এই মধুর স্রোত উম্মাহর হৃদয় মন বিশ্বাস প্লাবিত করে এগিয়ে চলে দেশ থেকে দেশান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে। পবিত্র কালামের এই বরকত, ফয়েয ও রহমতের ধারা শুষ্ক হয়নি কোনকালেই।

ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থগুলো মন্থন করলে সকল কালের প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞ আলেম সমাজ, শিক্ষক সাধক সংস্কারক ও দাঈদের জীবনব্যাপী কুরআনের ভালোবাসা, কুরআনের সাথে সুগভীর হৃদ্যতা, মগ্নতা ও আত্মনিবেদনের ঘটনাবলী যে কোন হৃদয়বান পাঠককে আলোড়িত করে। করে সঞ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত। এখানে আমরা এ জাতীয় কয়েকটি ঘটনা উদ্ধৃত করছি–

বিখ্যাত হাদীসবিশারদ ইতিহাসবিদ ও সমালোচক আল্লামা ইবনে জাওযী (রহ.) প্রতি সপ্তাহে কুরআনে কারীম একবার খতম করতেন। বিখ্যাত ফিলিস্তিনবিজেতা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর (রহ.) কুরআনে কারীমের সাথে নিগূঢ় সম্পর্ক ছিলো। কুরআনের তেলাওয়াত শুনতে তিনি খুবই ভালোবাসতেন। মহান এই অনুরাগী শ্রোতা প্রহরীদের কাছ থেকে প্রতি রাতে দুই পারা, তিন পারা, চার পারা করে শুনতেন। তাঁর হৃদয় ছিলো বিনয়ী কোমল আল্লাহর ভয়ে কম্পমান।[১]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াকে (রহ.) হিজরী ৭২৬ সালের ৭ই শা'বান নজরবন্দী করা হয়। আর সেখানেই তিনি ৭২৮ হিজরীর ২২ জিলকদে ওফাত লাভ করেন। এই সময়টাতে তিনি সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত থাকেন কালামে পাকের তেলাওয়াতে। এখানে তিনি প্রায় দু'বছর চার মাস বন্দী ছিলেন। এই সময়ে তিনি স্বীয় ভ্রাতা শাইখ যাইনুদ্দীন ইবনে তাইমিয়ার সাথে পবিত্র কুরআনের ৮০টি খতম করার পর যখন নতুন দাওর শুরু করেন এবং সূরা কামারের এই আয়াতে পৌছেন–

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ۝ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ۝

নিশ্চয়ই আল্লাহভীরুগণ বাগিচা ও নহরের মাঝে সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হবে এক ক্ষমতাধর বাদশাহর সন্নিকটে। *[কামার : ৫৪ : ৫৪-৫৫]*

---

১. তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমত

তখন ভাই যাইনুদ্দীনের পরিবর্তে আবদুল্লাহ ইবনে মুহিব ও আবদুল্লাহ ইবনুয যারঈ-এর সঙ্গে নতুন করে দাওর ও তেলাওয়াত শুরু করেন। আর এরা উভয়ই ছিলেন অত্যন্ত সৎ ও আল্লাহভীরু। পরস্পর সহোদর। ইমাম ইবনে তাইমিয়া তাদের তেলাওয়াত খুবই পছন্দ করতেন। এবারের খতম পূর্ণ হবার পূর্বেই জীবনের পাতা পূর্ণ হয়ে ওঠে। মহান প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যান পরপারে।[২]

এসব মনীষীর ভাষা ছিলো আরবী। তাদের সার্বক্ষণিক কর্ম ও গবেষণা ছিলো ইসলামী জ্ঞানের সেবা ও মণি-মুক্তার অনুসন্ধান। তাছাড়া যারা অনারব সাহিত্যিক, মাশাইখ ও আউলিয়ায়ে কেরাম, কুরআনের প্রতি ঝোঁক, অনুরাগ বন্ধন আকর্ষণ তেলাওয়াত ও মুখস্থকরণে তাদের অবস্থাও বিস্ময়কর, তাদের ঘটনাও অগণিত। এ সুবাদে বর্ণিত তাদের ঘটনাবলীতেও রয়েছে শিক্ষা ও আদর্শের উজ্জ্বল বিভা। অসংখ্য ঘটনাবলীর এই মহাভাণ্ডার থেকে অল্পক'টি উপমা আমরা এখানে পত্রস্থ করছি। অবশ্য কুরআনের প্রেম ও কুরআনের তরে সখ সুখ ও নিদ্রা বিসর্জন দানের এ বিস্ময়কর ধারা বহতা নদীর মতো এখনো বয়ে চলেছে দেশ, কাল ও জাতিকে বিধৌত করে, প্লাবিত করে।

হিজরী অষ্টম শতাব্দীর বিখ্যাত বুযুর্গ সুলতানুল মাশায়েখ হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রহ.) [মৃ. ৭২৫ হি.] কুরআনে কারীমকে সীমাহীন ভালোবাসতেন। কুরআনের আকর্ষণে তাঁর হৃদয় ছিল সদা স্পন্দিত। ভক্তদেরকে কুরআনে কারীম হেফয করার জন্য তাকিদ দিতেন, তেলাওয়াত করতে উৎসাহ দিতেন। আমীর হাসান আলা সানজারী (রহ.) যখন হযরত খাজা (রহ.)-এর কাছে বাইয়াত হন, তখন তিনি বয়সের ভারে ন্যূজ। জীবনভর নেশার মতো বুঁদ হয়ে পড়েছিলেন কবিতার আকাশে। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রহ.) তাকে পরামর্শ দিলেন, কুরআনের স্বাদ-রস যেনো কবিতার স্বাদ-রসকে পরাজিত করে। হযরত আমীর হাসান 'ফাওয়াইদুল ফুয়াদ' গ্রন্থে লিখেন– হযরত খাজা (রহ.)-এর বরকতপূর্ণ যবানে কতবার এই উপদেশ শুনেছি– 'কবিতা নয় কুরআনের তেলাওয়াতকে প্রাধান্য দিন।'

খাজা মুহাম্মদ ইবনে মাওলানা বদরুদ্দীন ইসহাক ভালো হাফেজ ছিলেন। কণ্ঠস্বর ছিলো অকৃত্রিম মধুময়। হযরত খাজা (রহ.) তাকেই নামাযে ইমাম নিযুক্ত করেছিলেন। তার তেলাওয়াত শুনে তিনি খুবই আপ্লুত হতেন, হৃদয় গলে

২. তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমত, ২য় খণ্ড, ১২২ পৃ.

যেতো তেলাওয়াতের পরশে, অকৃত্রিম স্বাদ-রসে আহ্লাদিত হতো প্রাণ-মন-বিশ্বাস।[১]

হযরত মাখদুমুল মুলক শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মুনিরী (রহ.) [মৃ. ৭৮৬ হি.] কুরআনে কারীমের অকৃত্রিম আশেক ছিলেন। তেলাওয়াতে কুরআনের প্রতি তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিলো। তার বিশেষ শিষ্য শাইখ যাইনুদ্দীন বদর আরাবী (রহ.) তাঁর মৃত্যুকালীন অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন–

বাদশাহ হুসামুদ্দীনের ভাই আমীর শিহাবুদ্দীন স্বীয় পুত্রসহ দরবারে উপস্থিত হন। সামনে গিয়ে আদবের সাথে বসে পড়েন। হযরতের দৃষ্টি ছেলেটির উপর পড়ে। হযরত বললেন, পবিত্র কুরআনের পাঁচটি আয়াত পড়তে পারবে? উপস্থিত সকলেই বললো, ও তো এখনো অনেক ছোট। সাইয়্যিদ মুফতী জহীরুদ্দীনের পুত্রও সেখানে উপস্থিত ছিলো। মিয়া হেলালুদ্দীন যখন বুঝতে পারলেন, হযরত কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত শুনতে উদগ্রীব, তখন তিনি মুফতী সাহেবের ছেলেকে ডেকে পাঁচটি আয়াত তেলাওয়াত করতে বলেন।

সায়্যিদ মুফতী জহীরুদ্দীন যখন দেখলেন, হযরতের মন এখন কালামে পাক শুনতে অধীর, তখন তিনি স্বীয় পুত্রকে ডেকে বললেন, পাঁচটি আয়াত তেলাওয়াত করে শোনাও। ছেলে আদবের সাথে বসে পড়লো এবং সূরা ফাতহের শেষ রুকুটি তেলাওয়াত করতে শুরু করলো। হযরত তখন বালিশে হেলান দিয়ে আরাম করছিলেন। তিনি উঠে বসলেন। অতীত দিনের রীতি অনুযায়ী আদবের সাথে বসে গভীর মনোযোগসহ তেলাওয়াত শুনতে লাগলেন।[২]

মুজাদ্দিদে আলফেসানী হযরত শাইখ আহমদ সরহিন্দী (রহ.) [মৃ. ১০৩৪ হি.]-এর জীবনীতে আছে, কুরআন তেলাওয়াত করার সময় তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে উঠতো। তার পড়ার ভাব ও গতি দেখে শ্রোতৃমণ্ডলী সহজেই অনুমান করতে পারতো, তেলাওয়াতের সাথে কুরআনের নিগূঢ় তত্ত্ব রহস্য বরকত ও রহমত অবতীর্ণ হচ্ছে। তিনি নামাযে কিংবা নামাযের বাইরে যখনই তেলাওয়াত করতেন ভীতিমূলক কিংবা প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসাসূচক আয়াত তেলাওয়াতকালে কণ্ঠের ছন্দ বদলে যেতো। সুর ও উচ্চারণে মূল মর্ম বাঙ্ময় হয়ে ওঠতো। রমযানে কমপক্ষে তিনবার কালামে পাক খতম করতেন। হাফেজ ছিলেন। তাই রমজান

১. তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমত, ৩য় খণ্ড, ২২-২৩ পৃ.
২. তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমত, ৩য় খণ্ড, ২৩৩ পৃ.

ছাড়াও মুখস্থ তেলাওয়াত করতেন সময় পেলেই। মজলিস বসিয়ে অন্যদের কাছ থেকেও তেলাওয়াত শুনতেন।[৩]

হযরত মাওলানা ফজলুর রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী (রহ.) [মৃ. ১৩১৩ হি.] একদিন কুরআনে কারীম তেলাওয়াত করছিলেন। তাঁর মধ্যে এক বিশেষ কাইফিয়্যাত ও আবেগ সৃষ্টি হলো। মৌলবী সায়্যিদ তাজাম্মুল হুসাইনকে (রহ.) বললেন, 'কুরআন তেলাওয়াতে আমরা যে স্বাদ ও তৃপ্তি অনুভব করি, যদি তার সামান্য পরিমাণও তোমরা অনুভব করতে পারতে, তাহলে স্থির থাকতে পারতে না। কাপড় ছিঁড়ে বনে চলে যেতে।' একথা বলে তিনি একটি অনুচ্চ চিৎকার দিয়ে হুজরায় চলে গেলেন এবং কয়েকদিন পর্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ে রইলেন।[৪]

মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ আলী (রহ.) বলেন, আমি একবার আরয করলাম, কবিতা পাঠে যে স্বাদ ও তৃপ্তি অনুভব করি, কুরআনে কারীমের তেলাওয়াতে সে স্বাদ পাই না কেন? তিনি বললেন, এখনো দূরে আছো। যদি কুরআনের ঘনিষ্ঠ হতে পারো, তাহলে কুরআনের তেলাওয়াতে যে স্বাদ তা অন্য কিছুতে পাবে না।[৫]

মৌলবী তাজাম্মুল হুসাইন (রহ.) লিখেন– হযরত (রহ.) আমাকে বললেন, কুরআনে কারীম এবং হাদীস শরীফ নিয়মিত পাঠ করবে। তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমার অন্তরে এসে আসন গ্রহণ করবেন।[৬] একদা তিনি বললেন, কুরআনে কারীমের সাথে সম্পর্কের চূড়ান্ত ফলাফল হলো সুলূক ও আত্মশুদ্ধি।[৭]

মৌলবী তাজাম্মুল হুসাইন লিখেন– একবারের ঘটনা। মজলিসে মাওলানা মুহাম্মদ আলী সাহেবসহ আরো অনেকেই আছেন। কুরআনে কারীমের তরজমা হচ্ছিলো। তরজমা হচ্ছিলো এই আয়াতটির–

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ٥

এবং তুমি কিতাবে ইবরাহীমের কথা আলোচনা করো। নিশ্চয়ই সে অত্যন্ত সত্যবাদী নবী ছিলো। *[মারয়াম : ১৯ : ৪১]*

তারপর হযরত ইসমাইল (আ.) সম্পর্কিত আয়াতটি পঠিত হলো–

وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

[৩]. প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, ১৭৯-১৮০ পৃ.
[৪]. তাযকেরায়ে মাওলানা ফযলুর রহমান গঞ্জমুরাদাবাদী, মাওলানা নদভী।
[৫]. প্রাগুক্ত, ৪৯ পৃ.
[৬]. প্রাগুক্ত, কামালাতে রাহমানির সূত্রে
[৭]. প্রাগুক্ত, রাসায়েলে তাসাউফের সূত্রে

আর সে ছিলো স্বীয় প্রভুর দরবারে খুবই পছন্দনীয়। *[মারয়াম : ১৯ : ৫৫]*

এই আয়াতের তরজমা করতে গিয়ে 'সে তার প্রভুর কাছে পছন্দনীয় ছিলো' বলেই তিনি চিৎকার করে ওঠলেন। বেহুঁশ হয়ে পড়লেন মুহূর্তের মধ্যে। এই ঘটনার পর দুই মাস তিনি অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে রইলেন।[১]

আরেকবারের ঘটনা। তাঁর সামনে কুরআনে কারীমের এই আয়াতের তরজমা করা হলো–

أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ٥

হে ঈসা! তুমি কি লোকদেরকে বলেছো, আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাকে ও আমার মাকে মা'বুদ হিসেবে গ্রহণ করো? *[মাইদা : ৪ : ১১৬]*

অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.)কে প্রশ্ন করা হবে, তুমিই কি মানুষকে এই মর্মে আহ্বান করেছিলে, আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে আর আমার মাকে খোদা হিসেবে গ্রহণ করো? উত্তরে হযরত ঈসা (আ.) ভয়ার্ত কণ্ঠে বলবেন–

إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

সঙ্গত তো ছিলো 'গাফুরুর রাহীম ' বলা। কিন্তু হযরত ঈসা (আ.) ভয়ে বলে ফেললেন, 'আযীযুন হাকীম'। এই আয়াত পড়তেই যেনো কেয়ামতের ভীতিপ্রদ অবস্থা উপস্থিত হয়ে উঠলো সম্মুখে। কেয়ামতের ভয়ংকর বিপদ দিবস যেনো মুহূর্তে নেমে এলো মাটিতে। ভীতি ও শংকা ছেয়ে ফেললো সকলকে। আমার যতোটুকু মনে পড়ে, যখন হযরতের সামনে এই আয়াত তেলাওয়াত করা হয়–

وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا

তখনই এ কথা বলে চিৎকার করে উঠলেন, সকলকেই পুলসিরাতের উপর দিয়ে যেতে হবে।

সারকথা, এই মজলিসে সকল বিষয়েই আলোচনা হতো। এর প্রভাব সর্বপ্রথম প্রকাশ পেতো হযরতের মধ্যে। তারপর যোগ্যতা ও অবস্থাভেদে সকলেই আন্দোলিত হতো অলৌকিক প্রভাব দোলায়।[২]

[১]. প্রাগুক্ত, ফযলে রাহমানী, ৩২ পৃ.-এর সূত্রে
[২]. প্রাগুক্ত, ফযলে রব্বানী, ৩২ পৃ.-এর সূত্রে

সমকালীন বিখ্যাত বুযুর্গ পীরে কামেল হযরত মাওলানা আবদুল কাদের রায়পুরী (রহ.) স্বীয় পীর ও মুরশিদ মাওলানা শাহ আবদুর রহীম রায়পুরী (রহ.) [মৃ. ১৩৩৭ হি. ১৯১৯ ঈ.] সম্পর্কে লিখেন–

আমি হযরতকে কুরআন মাজীদ পড়তে দেখেছি। তিনি তাহাজ্জুদ নামাযে দীর্ঘ তেলাওয়াত করতেন। তেলাওয়াত করতেন আর মাঝে মধ্যে কাঁদতেন। বিশেষত যখন জাহান্নামের আযাব সম্পর্কিত আয়াত তেলাওয়াত করতেন, তখন কেঁদে কেঁদে ক্ষমা চাইতেন আল্লাহর দরবারে। আবার যখন রহমত, দয়া ও অনুগ্রহ সম্পর্কিত আয়াত তেলাওয়াত করতেন, তখন খুশি হতেন। মাঝে মধ্যে নীরব হয়ে থাকতেন।[৩]

হযরত আবদুল কাদের রায়পুরী (রহ.)-এর সম্পর্ক ছিলো কুরআনে কারীমের সাথে গভীর। তাঁর এক নির্ভরযোগ্য খাদেমের ভাষায় শুনুন–

'হযরতের শরীর যখন সুস্থ ছিলো, তখন রমযান মাসের আসর নামাযের পর মজলিস থেকে আলাদা হয়ে নিরালায় বসে কুরআনে কারীমের তেলাওয়াতে মশগুল হতেন। এক ব্যক্তি যিনি সেখানেই থাকতেন– পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হযরতের তেলাওয়াত শুনতে পেলো। হৃদয়জাত ও প্রাণনিংড়ানো তেলাওয়াত। তার হৃদয় ছুঁয়ে গেলো। তিনি মনে মনে অবচেতনভাবে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আমাকেও এভাবে কুরআন তেলাওয়াতের তাওফিক দাও।'

রমযানুল মুবারক অতিক্রান্ত হওয়ার পর হযরত সম্ভবত সেই ব্যক্তিকেই ডাকলেন। বললেন, এসো আর শোনো, কুরআনে কারীম এমনভাবে তেলাওয়াত করবে, যেভাবে মূসা (আ.) আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন এবং একথা কুরআনে কারীমেই আছে। হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর সাথে কথা বলতেন আর বৃক্ষ থেকে তার জবাব শুনতেন। তেলাওয়াত করার সময় নিজেকে সেই বৃক্ষটি ধারণা করো। তারপর তোমার মুখনিঃসৃত কুরআনের শব্দগুলোকে মনে করো যেনো আল্লাহই বলছেন সরাসরি। এতোটা গভীর মনোযোগসহ কান পেতে শোনো, যেনো তুমি সরাসরি আল্লাহর শব্দেই কুরআন শুনছো। এ কথা বলার পর ঠিক এমন একটি অবস্থাই তাকে ছেয়ে ফেললো। কথার প্রভাব ও ফল হলো এই, অলৌকিক এই ভাব ও অবস্থা তার অন্তরে গিয়ে ঠাঁই নিলো।[৪]

---

৩. এই লেখকের সাওয়ানেহে মাওলানা আবদুল কাদের রায়পুরী, ৬১ পৃ.
৪. প্রাগুক্ত, ৩৭-৩৮ পৃ.

একটি অভিজ্ঞতা : একটি পরামর্শ

কুরআনে কারীমের সাথে শক্তিশালী সম্পর্ক গড়তে হলে, কুরআনে কারীমের সাথে বন্ধন ও হৃদ্যতা সৃষ্টি করতে হলে, কুরআনে কারীম থেকে বিপুলভাবে উপকৃত হতে হলে, কুরআনে কারীমের মাধ্যমে উন্নতি ও আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্য অর্জন করতে হলে অভিজ্ঞতার আলোকে আমি একটি পরামর্শ দিচ্ছি। আমি বলি, যতদূর সম্ভব কুরআনে কারীমের সাথে সরাসরি সম্পর্ক গড়ে তুলবে। মূল কুরআনের সাথে ভাব গড়ে তুলবে। যত বেশি সম্ভব তেলাওয়াত করবে। এতে স্বাদও সৃষ্টি হবে, ঝোঁক এবং আগ্রহও সৃষ্টি হবে। তেলাওয়াতের সময় কুরআনের অর্থ-মর্ম সম্পর্কেও গভীরভাবে চিন্তা করবে। যদি প্রয়োজন পরিমাণ আরবী জানা থাকে এবং কুরআনের মর্ম বুঝার মতো যোগ্যতা থাকে, তাহলে সরাসরি কুরআনে কারীমই তেলাওয়াত করবে। আর যদি তা না হয়, তাহলে কোন নির্ভরযোগ্য অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত টীকার সাহায্য নেবে। তবে যতোদূর সম্ভব মানুষের বুঝ ও ব্যাখ্যার মধ্যে নিজেকে আটকে রাখবে না। বারবার তাফসীর খুলে বসার পরিবর্তে বরং বারবার তেলাওয়াত করার মাধ্যমে কুরআনের স্বাদ আস্বাদন ও তার মর্ম অনুধাবনের চেষ্টা করবে। একটা সময় পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকলে আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ায় যদি কিছু অর্জিত হয়, তাহলে প্রাণ খুলে শুকরিয়া জ্ঞাপন করবে।

হ্যাঁ, যদি কোনো সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে সেক্ষেত্রে শব্দের বিশ্লেষণ, সংশয়ের অপনোদনের জন্য কিংবা যদি কোথাও শানে-নুযূল জানা ছাড়া মর্ম উদ্ধার অসম্ভব হয়ে পড়ে, তাহলে সেক্ষেত্রে তাফসীর গ্রন্থের সাহায্য তো নিতেই হবে। অন্যথায় (আরবী-উর্দুর) তাফসীর গ্রন্থসমূহের বিস্তারিত আলোচনা, লেখক তাফসীরকারদের সূক্ষ্ম তত্ত্ব বিশ্লেষণ থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকবে। কারণ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কুরআনে কারীমের স্বচ্ছ বর্ণনার উপর মানুষের বিবেক, চিন্তা এবং জ্ঞানেরও ছায়া পড়ে থাকে, যেভাবে স্বচ্ছ ঝর্নার উপর তার তীরে দাঁড়ানো ঘন বৃক্ষের ছায়া পড়ে থাকে। অতঃপর তার মধ্যে সেই স্বাদ, প্রকৃত রূপ, কালামে ইলাহীর মাধুর্য ও অকৃত্রিমতা অবশিষ্ট থাকে না। আর এটাই হলো মূল প্রাণ। বরং অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, পাঠক কোনো যোগ্য মেধাবী মানুষের বুঝ ও উপলব্ধি দ্বারা (যার দ্বারা সে পূর্ব থেকেই প্রভাবিত) এতোটা প্রভাবিত হয়ে পড়ে, যতোটা সে কুরআনের মূল কালাম দ্বারা প্রভাবিত হয় না। যে কোনোভাবেই হোক তার অন্তরে অনুভূতিতে এটা স্থির হয়ে বসে পড়ে কুরআনে

কারীমের শ্রেষ্ঠত্ব সম্মান সৌন্দর্য সৌকর্য এই মনীষীর ব্যাখ্যা ছাড়া বুঝাই সম্ভব হতো না। কমপক্ষে এতোটুকু অবশ্যই দেখা যায়, এতে করে মানুষ আল্লাহর কালামকে বিশেষ একজন তাফসীরকার অথবা ব্যাখ্যাকারীর চশমায় দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।[১]

এটা একটা অত্যন্ত নাজুক প্রসঙ্গ। সংশয় বোধ করছিলাম, বিষয়টি কি আলোচনা করবো, নাকি করবো না। এতে আবার কোনোরূপ ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয় কি না। কিন্তু এই রচনা চলাকালীন সময়েই আকস্মিকভাবে মাওলানা আবদুল বারী নদভী সাহেব মরহুম (জামিয়া উসমানিয়া হায়দারাবাদের আধুনিক দর্শন ও তাফসীরুল কুরআনের অধ্যাপক)-এর একটি রচনা আমার নজরে পড়ে। রচনাটির শিরোনাম 'মেরি মুহসিন কিতাবে'।[২] মাওলানা (রহ.)-এর কুরআনে কারীমের প্রতি বিশেষ ঝোঁক ছিলো। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে বিশেষ ব্যুৎপত্তিও দান করেছিলেন। এই লেখক এ বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে উপকৃত হওয়ারও সুযোগ লাভ করেছে। যখন দেখলাম, আলোচ্য বিষয়ে তিনিও অভিমত ব্যক্ত করেছেন তার নিজস্ব ভঙ্গিতে, তখন হৃদয়ে গভীর স্বস্তি অনুভব করলাম। অবশেষে তার লেখার উদ্ধৃতি দিয়েই রচনার সমাপ্তি টানছি। তিনি লিখেছেন–

'এটা কোনো বলার কথা নয়। তবুও মন আপনাকে বলতে চাচ্ছে। আমার অবস্থা তো এখন এমন– ভাষা ও অভিধানের নিরিখে অর্থ বুঝে ফেলার পর কিংবা যেখানে ঘটনা সংশ্লিষ্ট বিষয় রয়েছে, সেখানে মূল ঘটনাটা জানার পর– যেখানে যে পরিমাণে এই কালামুল্লাহর সাথে কালামুন্নাস তথা আল্লাহর কালামের সাথে মানুষের কালামকে যুক্ত করে দেয়া হয়েছে (সর্বদা নয়, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে); মনে হয় যেনো যেখানে 'আলো' পেয়েছিলোম, সেখানে 'আঁধার' এসে ছেয়ে যাচ্ছে।

সুতরাং وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى এর মধ্যে নিজের পক্ষ থেকে আরোপিত যতোটুকু ইলম লাভ হয়, হয়তো বা খালেস ওহীর ইলমের পথে ততোটুকুই বাধার সৃষ্টি হয়, ব্যাহত হয় আসমানী ফয়যানের ধারা। তাই আমি মনে করি, মুফাসসিরের

---

[১]. এ কথাগুলো কুরআনে কারীমের মধ্যমশ্রেণীর পাঠকদের জন্য। উচ্চমানসম্পন্ন আলিম সম্প্রদায় শিক্ষক, লেখক দার্শনিক বিষয়াবলীর গবেষক লেখকদের বিষয় এ থেকে আলাদা। তাদের তো অনেক সময় কাড়ি কাড়ি তাফসীর গ্রন্থ, অভিধান, নাহুগ্রন্থ, আরিফীন, ও গবেষকদের রচনাবলী পড়তে হয়। এটা তাদের জন্য অনস্বীকার্য প্রয়োজন।

[২]. মাশাহীরে আহলে ইলম কী মুহসিন কিতাবে– (মাকতাবা নাদওয়াতুল উলামা থেকে প্রকাশিত) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত একটি রচনা।

ইলম ও তাকওয়ার অনুসন্ধান না করে মুখস্থ যে কোনো তাফসীর গ্রন্থ পাঠ করা খুবই বিপজ্জনক। তবে কারো ইলম এবং তাকওয়াও তাকে রক্ষা করতে পারে। আর আজকাল তো সকলেই মুফাসসির আর সকল পত্র-পত্রিকা তো তাফসীর প্রকাশের জন্য হাত বাড়িয়ে আছে।

আরেকটি কথা হচ্ছে– মানুষ পূর্ণ কুরআন বুঝা ও বুঝানোর ধান্ধায় পড়ে যায়। এতে কোনো সন্দেহ নেই, সমগ্র কুরআন সমগ্র মানবজাতির হেদায়েতের জন্য অবতীর্ণ। কিন্তু প্রতিটি মানুষের জন্য পূর্ণ কুরআন অনিবার্য নয়। যেভাবে বিশাল এই পৃথিবীর সমগ্র খাদ্যসামগ্রী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য নয়; বরং সমস্ত মানবের জন্য। তাই যদি প্রত্যেক মানুষ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا এর অধীনে চিন্তা করে, সমগ্র মানুষ তো দূরের কথা দু'চারজনের অংশও একা খেয়ে বসে, তাহলে স্বাভাবিকভাবে বদ হজমের শিকার হবে। আবার দুর্ভাগ্যক্রমে মারাও যেতে পারে।

যেভাবে যে কোনো খাবার যে কোনো স্থান ও পরিবেশের ব্যক্তির স্বাস্থ্যসম্মত হওয়া জরুরী নয়, আধ্যাত্মিক রিযিকের অবস্থাও অনুরূপ। বরং আত্মজগতের রঙ চাহিদা ও প্রয়োজন শরীরের রঙ চাহিদা ও প্রয়োজনের তুলনায় বেশি এবং বিভিন্ন স্বভাবের। তাই একজন অন্যজনের অংশ কিভাবে লাভ করবে?[১]

স মা প্ত

---

[১]. মুহসিন কিতাবে, ২৬-২৭ পৃ.

আমাদের প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বই

কুরআন অধ্যয়নের মূলনীতি

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.

ISBN : 984-70168-0071-9

Kuran Oddoyner Molniti

Syeed Abul Hasan Ali Nadwi

design : shakir ahsanullah